সেরা মানুষ

দাদাঠাকুর

নির্মলরঞ্জন মিত্র



১৩৮৫

প্রথম সংস্করণ :
বৈশাখ, ১৩৫৮ :

প্রকাশক :
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩
৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অরুণকুমার ঘোষ

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

বৌদি শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্র
বড়দি শ্রীমতী কমলা ঘোষ
মেজ বৌদি শ্রীমতী নীলিমা মিত্র
ছোট বৌমা শ্রীমতী অনুভা মিত্র
আর
ছোট বোন শ্রীমতী ঊর্মিলা বসুকে।

—লেখক।

॥ আনন্দমূর্তি মহাপুরুষ দাদাঠাকুর ॥

আমার এই সুদীর্ঘ ৮৫ বৎসরের জীবনে যে কয়জন, সত্যকার মহাপুরুষ যাঁহাদের বলিব, এমন মানবের সঙ্গে পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শরৎ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা প্রথম কয়েকটি নামের সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা ছিলেন, গীতার কথা অনুসারে, "বিভূতিমৎ সত্ত্ব"—শাশ্বত সত্তা বা সত্ত্বের তেজ বা মহিমার এক বিশেষ অংশ বা প্রকাশ। অন্য মহাপুরুষের সঙ্গে ইঁহাদের তুলনা হয় না। কিন্তু সমাজে ছোট-বড় নানান উচ্চকোটির ব্যক্তিত্বের, আমাদের সৌভাগ্য-বশতঃ, অভাব এখনও হয় নাই।

যেসব মনীষী ও ঋষিকল্প ব্যক্তি, জ্ঞানী ও গুণী, গুরু ও দেশিক, চরিত্রবান ও হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ আসিয়া দেখা দেন, জীবনকে পূত ও সার্থক করিয়া তুলিতে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন দিব্য প্রতিভায়,—অসাধারণ রসজ্ঞতায়, আশুকবিত্ব শক্তিতে, মানুষের দোষ-গুণ ধরিবার ও উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া ফেলিবার মানবোত্তর ক্ষমতায় তিনি যেন ছিলেন এই জগতের ঊর্ধ্বের দৈব-গুণসম্পন্ন কোনও জগত হইতে আগত এক বিস্ময়। নানা অলৌকিক শক্তি, সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁহার রহন-সহন, ধরন-ধারণ, চলন-বলন, মনন-বচন, গায়ন-পাঠনে প্রকাশিত হইত, তাহা তাঁহার ঋজু সুদীর্ঘ সুগৌর সুনাসিক সুনয়ন দেহ-সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হইয়া সকলের মন হরণ করিত ; এবং যেন রাজ

মর্যাদায় ভূষিত সেই দেহ-সৌন্দর্যকে তাঁহার সরলতম অনাড়ম্বর বস্ত্র-সজ্জায়—একখানি সাদা ধুতি ও কাঁধে যেন অবহেলার সঙ্গে ফেলা একখানি সাদা উত্তরীয়—স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিত, শ্রদ্ধায় সকলেরই মাথা তাঁহার পাদুকা-বর্জিত দুই চরণ-কমলের ধূলিকণার জন্য সম্ভ্রমের সঙ্গে অবনত হইত। আর তাঁহার হৃদয়ের কথা কি বলিব—তাঁহার মত সত্যকার সহানুভূতিশীল দরদী এখন জগতে দুর্লভ। দুঃখী মানুষ, বিশেষ করিয়া নিরপরাধ নিপীড়িত অত্যাচারিত নিরুপায় মানুষের দুঃখ, এই নির্ধন সহায়-সম্বলহীন সত্যবাক তেজস্বী সদা-শিব-সঙ্কল্প ব্রাহ্মণের মনকে বিচলিত করিত। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে তাঁহার লঘু রসালাপের অন্তরালে একটা সদাজাগ্রত লোকহিতৈষণা তাঁহাকে জীবনে কখনও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট সহিষ্ণু-প্রকৃতির করে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের ছোট-খাট নানা ব্যাপারে প্রকাশ পাইত।—প্রত্যুত এই অতি মূল্যবান চরিতকথায় শ্রীযুক্ত নির্মলবাবু এরূপ কতকগুলি ঘটনার কথা বলিয়াছেন, যেগুলির কথা পড়িয়াই বা শুনিয়াই নিঃশব্দে যিনি শাশ্বত সত্তায় আত্মনিবেদিত হইয়া ছিলেন, আর্ত্ত মানুষের সেবাকেই যথার্থ দেবসেবা বলিয়া সহজভাবে যিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, বিশ্বজনের হিতসাধনই যে সত্যকার ব্রাহ্মণ্য এবং সত্যকার মানবিকতা এই বোধের দ্বারা যিনি অনুপ্রাণিত, সেই প্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষটির প্রতি সম্ভ্রমে আমাদের চিত্ত অবনত হয়, সহৃদয় মানব মাত্রেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় উদ্‌বেলিত হয়। প্রদীপের সাহায্যে সূর্য দেখাইবার চেষ্টা করিব না। আমাদের পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা যে, শ্রীযুক্ত নির্মলবাবু শরৎ পণ্ডিত মহাশয়ের এই আদর্শ এবং আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের একটু দিগ্‌দর্শন সার্থকভাবে আমাদের করাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য

তাঁহাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, আশীর্বাদ করিব, তাহা জানি না।

শরৎ পণ্ডিত মহাশয় সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কেহ-কেহ প্রসঙ্গ করিয়াছেন, এবং যাঁহারাই স্বল্পকালের জন্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এমন পরিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাঁহার জীবনের সব কথা সম্বন্ধে এমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শন লইয়া, আর কেহ এই কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন কি না, আমার জানা নাই। কেবল যে চরিত্র-মাহাত্ম্য ও চরিত্র-মাধুর্য সম্বন্ধে জ্ঞান তাহা নহে, তাঁহার সম্বন্ধে যে পূর্ণ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞান ও পূর্ণ ভালবাসা লেখকের মনে বিদ্যমান, তাহা তাঁহার রচনাকে এত রস-সমৃদ্ধ এবং রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। বিষয়-বস্তুর গৌরব তো আছেই, প্রকাশ-ভঙ্গীও অনবদ্য। নির্মলবাবুদের পরিবারের তিন পুরুষের ঘনিষ্ঠতা—উভয় পরিবারের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তা-সূত্র অচ্ছেদ্য গ্রন্থন-রশ্মিরূপে বিদ্যমান ছিল। জঙ্গিপুরের এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবার এবং কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত এই মিত্র-কায়স্থ পরিবার—আধুনিক বাঙ্গালার এইরূপ দুইটি সংস্কৃতি ও শিক্ষা পূত সজ্জন গোষ্ঠীর মিলনের এক দুর্লভ মনোহর পুষ্প ও ফল হইতেছে শরৎ পণ্ডিত মহাশয়ের এই জীবন-কথা ও তাঁহার নানা স্মৃতি।

পণ্ডিত মহাশয়ের রসিকতা, শব্দ লইয়া তাঁহার অদ্ভুত পরিহাস-মিশ্র খেলা—এসব তাঁহার শ্বাস-গ্রহণের মতই সহজ ও সাবলীল এবং নির্বাধ ছিল। সাগর-লহর লীলা কে কথায় ধরিয়া রাখিবে? তবুও যেখান থেকে যাহা কিছু লেখক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, সব যেন উজাড় করিয়া নানা কথা, দুঃখ-হর্ষের নানা উপাখ্যান, নানা রসিকতা, ময়মনসিংহের,

মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারে তাঁহার অবস্থান,—এত খুঁটিনাটির সঙ্গে তিনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন—শুনিয়া তৃপ্তি হইত না, এবং এই সব কথার অন্তর্নিহিত মানবিকতা আমাকে আকুল করিত। এসব কথার অনেক কিছুই নির্মলবাবুর পুস্তকে পাওয়া যাইবে। আরও যাহা পাওয়া যাইবে, সব মিলাইয়া তাহা হইতেছে একটি স্বর্ণ পেটিকা—একটি রত্ন-সম্পুট। এই রত্ন-সম্ভার শুভ্র সুগন্ধি যুথিকা-মাল্যের মতই গ্রন্থকার বঙ্গভারতীর চরণে আনিয়া উৎসর্গীকৃত করিলেন।

এই নির্মাল্য চিরকাল বঙ্গভাষীগণের ও বঙ্গভাষানু-রাগীগণের পক্ষে আনন্দদায়ক হইবে।

শ্রীযুক্ত নির্মলরঞ্জন মিত্র জয়যুক্ত হউন। ইতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
এম. এ এল. এল বি,
ডি. ফিল., এফ. এ. এস.

টেলিফোন : ২৪-২৩৭৫
২৩ নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

২৩।১১।৭৫

শ্রীনির্মলরঞ্জন মিত্র রচিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত—(দা'ঠাকুর) কৌতূহলের সঙ্গে পড়লুম। গল্পচ্ছলে জীবনীটি সরস, সাবলীল ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখক দাদাঠাকুরের অপূর্ব চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন। লেখাটিতে অনেক নূতন তথ্য আছে, যা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। দাদাঠাকুরের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা, সরল জীবন, চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই রচনায়। এ ছাড়াও আছে তাঁর অনেক হাসির গান ও কবিতা, কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র। সমস্ত মিলিয়ে শ্রীমিত্র একটি মনোজ্ঞ জীবনী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, যার অনেকখা।ন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। গল্প-উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক দাদাঠাকুরের জীবনী। আমারও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এই অনন্য রসিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। 'দাদাঠাকুর' চলচ্চিত্র ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে ভারত-বিখ্যাত করে তুলেছিল। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের রচিত জীবনীতে তাঁর মধুর অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে।*

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

*পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় দাদাঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলীর কিছু আলোচনা হয়েছিল; সেই আলোচনা পাঠ করে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র উপরোক্ত পত্রখানি লিখেছিলেন।

॥ লেখকের নিবেদন ॥

'দাদাঠাকুর'। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসী স্বনামধন্য ব্যক্তি শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত দেশের লোকের কাছে 'দাদাঠাকুর' নামেই পরিচিত ছিলেন। কোমল প্রাণ দাদাঠাকুর তাঁর অসাধারণ রসজ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি, আশু-কবিত্বশক্তি আর স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে ছোট-বড় সকলকেই প্রায় মুগ্ধ করতেন। এ হেন দাদাঠাকুর কিন্তু অন্যায় আর অসাম্যের কাছে মাথা নোয়ান নি, প্রয়োজনে তিনি অতি কঠোর হয়ে উঠতেন।

অনাড়ম্বর দাদাঠাকুরের পরনে থাকতো ফর্সা থান-ধুতি, গায়ে সুতির চাদর। গ্রীষ্মকালে অবশ্য চাদর বেশি ব্যবহার করতেন না। আর শীতের সময় গায়ে থাকতো একখানি পশমী চাদর। তাঁর কাপড়ের কোঁচা থাকতো বেড় দিয়ে কোমরে বাঁধা, আর কোঁচার খুঁটে তিনি শক্ত করে বেঁধে রাখতেন পয়সা-কড়ি। আর থাকতো কাঁধে একটি গামছা, বগলে ছাতা। ছাতাবিহীন 'দাদাঠাকুর' কল্পনা করাও শক্ত। ছাতাটি দেখিয়ে বলতেন—'রোদে ছায়া, জলে ঘর—যে না বয় সে বর্বর'। আজীবন নগ্নপদ দাদাঠাকুর এও বলতেন, 'বোগদাদের রাজাও খালি-পা (Khalipha of Bugdad)'।

অটুট-স্বাস্থ্যের অধিকারী দাদাঠাকুর অনায়াসে হেঁটে ভবানীপুর, বালীগঞ্জ বা হাওড়া ঘুরে আসতেন দিনের পর দিন। ক্বচিৎ কখনো ট্রামে চড়তেন—দ্বিতীয় শ্রেণীতে। বলতেন—'ট্রামে চড়বো কি, সব সময়েই দেখি ট্রামে ঝুলন আর রাস (Rush) একই সঙ্গে চলছে'!

বাঙলাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যাঁরা দাদাঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁর অনন্য সাধারণ গুণাবলীতে।

সকল কাজেই দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল দাদাঠাকুরের। সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করতেন তিনি। বলতেন—'নরম নরম দুঃখগুলোকে সুখ মনে করে মানুষ!—বলে, 'সুখের চাক্‌রি', 'পাকা চাক্‌রি'। কিন্তু দাসত্ব কখনো সুখের হয় না; মানুষ নিজেও চিরজীবী নয়, অথচ 'পাকা চাক্‌রি'র কথা ভাবে'।

প্রথম জীবনে দাদাঠাকুর বিদগ্ধ-সমাজ আর জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিদূষক'এর মাধ্যমে। ১৩২৯ সালের ৬ই মাঘ শনিবার 'বিদূষক'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করেন তিনি। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সব রচনাই তাঁর নিজের, সব ক'টিই কবিতায় লেখা। নিজে লিখে, কম্পোজ করে ছাপিয়ে তিনি কলকাতার পথে পথে ফিরি করতেন। এই প্রসঙ্গে রসিকতা করে মাঝে মাঝে বলতেন—'যদি নিজে গ্রাহক হতে পারতাম—তাহলেই কাগজ Self-Supporting হতো'।

প্রসঙ্গতঃ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের দাদাঠাকুরের উপর কিছু মন্তব্য এখানে তুলে দিলাম।

মহামহোপাধ্যায় তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছিলেন: 'এখানে ('জেমো কান্দি'তে) একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহার সোজাসুজি নাম শরৎ পণ্ডিত···'বিদূষক'-এর এডিটর, প্রুফ-রীডার, কম্পোজিটর, ডেস্‌প্যাচার—তিনি কেবল সাবস্ক্রাইবার নন।··· ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকে হক্ কথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই, সদানন্দ পুরুষ।'

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাঙলাদেশের অর্ঘ্যথালে তিনি যে খাঁটী দেশী নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে হয়ত আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু তার ঝাঁঝালো স্বাদ সদ্য আহরিত, নির্ভেজাল রসে পরম উপভোগ্য।'

[জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৩।১।১৩৭৯]

*　　*　　*　　*

বিদূষকের আগে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দাদাঠাকুর ১৩২১ সালে। এই পত্রিকাটির মাধ্যমেও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। পত্রিকাটিতে প্রধানতঃ নীলামের ইস্তাহার ছাপা হতো এবং তার সঙ্গে থাকতো কিছু কিছু স্থানীয় সংবাদ। 'বিদূষক' পত্রিকাটি সাধারণতঃ কলকাতা-বাসীদের জন্য। অল্প কয়েক বৎসর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে সমাজের নানারকম অন্যায় আর অসাম্যের প্রতি ক্ষুরধার প্রতিবাদ প্রকাশিত হতো। সত্যবাক্ তেজস্বী পুরুষ দাদাঠাকুর ছিলেন দীন-দুঃখী, নিরপরাধ আর অসহায় মানুষের পরম বন্ধু। কিন্তু তিনি কোন কাজেই নিজেকে জাহির করা পছন্দ করতেন না, এটা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

এ হেন দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের পরিবারের, তাঁর জীবনের শেষের দিকের প্রায় তিরিশ বৎসরকাল। এ সময়ে কলকাতায় এলেই হাতিবাগানের কাছে ৪নং কার্তিক বসু লেন-এ আমাদের বাড়িতেই থাকতেন তিনি। একেবারে শেষের দিকে হাওড়ার রেলওয়ে কোয়ার্টারে মেয়ে জামাই-এর কাছেও থেকেছেন দাদাঠাকুর।

কাছে পেয়ে দাদাঠাকুরকে যখনই তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্য বলেছি আমরা, তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন সে অনুরোধ। আবার কখনও বা স্বভাবসুলভ রসিকতার সুরে উত্তর দিয়েছেন—

'আত্মজীবনী যদি লিখি কি নাম দেবো জানিস?—নাম দেবো "চিরতার মোরব্বা"।'

যাই হোক, আমার অগ্রজ শ্রীঅমল মিত্রের পীড়াপীড়িতে তিনি শুরু করেছিলেন আত্মজীবনী লেখার কাজ, কিন্তু নানাবিধ কারণে লেখাটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে তাঁর কাছে শুনে আমরা তাঁর জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার যতটা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম, আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের তাগিদে উৎসাহিত হয়ে, তার কিছু সহ দাদাঠাকুরের নিজের লেখা (অসমাপ্ত জীবনকথা এবং অন্যান্য রচনাদির কিছুটা) এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করলাম। দাদাঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবনচরিত ও জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, দাদাঠাকুরের জীবদ্দশাতেই একটি ছায়াচিত্র নির্মিত হয়েছিল তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী অবলম্বনে। কোন জীবিত মানুষের জীবদ্দশায় ছায়াচিত্র নির্মাণ বিশ্বে বোধহয় এটাই প্রথম। ছায়াচিত্রটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই ছায়াচিত্রটি দেখানোর জন্য মুর্শিদাবাদের তৎকালীন জেলাশাসক স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় এক প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন দাদাঠাকুরকে। ছায়াচিত্রটি সম্পর্কে তারিখের The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :

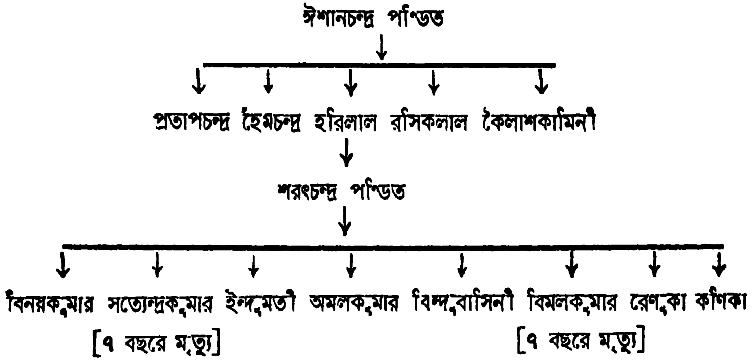
'......Interestingly, that remarkable man, Sarat Pandit. who is the original of the film, Dada Thakur, is still around town. He was staying in a house in Howrah when the award was announced. It is the film which has been acclaimed, not the man whose biography it is supposed to be. Therefore this wit and sage can still wander about—although he is an octogenarian, it is reported that, impelled by fancy, he treks from place to place—unnoticed even by those who have seen the film'......

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দাদাঠাকুরের কথাবার্তার বেশির ভাগই লিপিবদ্ধ করেছিল শ্রীমান লবকুমার। তার লেখা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ জানাই শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র দাশ 'রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী'র প্রধান শ্রীযুক্ত দাউদয়াল মেহ্‌রা মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে বইখানি প্রকাশিত হলো। শ্রীযুক্ত মেহ্‌রা মহাশয়ের উৎসাহ পেয়ে গ্রন্থটির কাজ শুরু করি। এছাড়া অন্যান্য যাঁদের কাছে উৎসাহিত হয়েছিলাম তাঁদের নামও এখানে উল্লেখ করছি। উৎসাহদাতাদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ, অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মাইতি, কবি সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। পতিতপাবন-বাবু পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং নানাবিধ উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে যথেষ্ট উপকার করেছেন।

এছাড়া অন্যান্য আরও যাঁদের কাছে উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রীঅমল মিত্র, শ্রীপ্রভাতকুমার বসু, ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী অনুভা মিত্র, শ্রীমতী নীলিমা মিত্র, শ্রীআদিত্য সিংহ রায়, শ্রীঅনিলকুমার বসু, শ্রীশ্যামাপদ সেন (গুপ্ত) শ্রীকল্যাণকুমার দাস, শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্র, শ্রীমতী কমলা ঘোষ, শ্রীমতী উর্মিলা বসু, শ্রীভূষণচন্দ্র দাস, শ্রীশুভ্রকান্তি (শোভন) মিত্র ও 'রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী'র কর্মী শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। তাছাড়া বহুবিধ তথ্য এবং দাদাঠাকুরের রচনাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন দাদাঠাকুরের সুযোগ্য পুত্রদ্বয়—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত। এছাড়াও 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আর 'বিদূষক' পত্রিকা থেকেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থখানিতে দিয়েছি। প্রচ্ছদপটে ব্যবহৃত আলোক-চিত্রটি শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ঘোষাল মহাশয়ের সৌজন্যে পেয়েছি।

নির্মলরঞ্জন মিত্র।

॥ বংশলতিকা ॥



॥ পরিচয় ॥

'আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ আমাকে কেহ বাবাঠাকুর, কেহ কাকাঠাকুর—অর্থাৎ যার যে সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকতো, তবে 'দাদাঠাকুর' বলে ডাকার লোক সংখ্যা খুব বেশি তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়, এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।'

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত

[illegible]

[দাদাঠাকুরের হস্তাক্ষর]

দাদাঠাকুরের

স্বরচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং
দুখানি চিঠির অংশ বিশেষ।

॥ পাঁয়তারা ॥

"সুবা বাংলা" বললেই যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ-কেই বোঝাতো অর্থাৎ যখন তিনটি প্রদেশই এক শাসনকর্তার শাসনাধীনে ছিল, সেই সময়ের রেভিনিউ বিভাগের "আণ্ডার সেক্রেটারী" শ্রীযুক্ত (এখন স্বর্গীয়) যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় তাঁর পুত্রগণের কাছে হয়ত কোন কথা প্রসঙ্গে গল্পচ্ছলে আমার কথা আলোচনা করেছিলেন। পিতৃদেবের সেই গল্প শুনে তাঁর ছেলেরা আমার সম্বন্ধে যে কি ধারণা করেছিল তা তারাই জানে। মিত্রজা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিকা আমার বাসস্থল জঙ্গিপুর মহকুমায় চাকরি করতে গিয়ে আমাদের আত্মীয়তার আঁকড়ানিতে বেঁধে, আমাকে যে বিয়োগ ব্যথা দিয়ে গেছে তা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারবো না। কালিকা বলতো—"দাদা, আশীর্বাদ করো যেন দাসত্বের বাঁধন কাটতে পারি"। আমাদের আশীর্বাদের এমনই জোর যে, সে সকলের অগোচরে দুনিয়ার মায়ার বাঁধন কেটে চলে গেল। কালিকাদের বাড়ীর আর কারো সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।

একদিন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর দক্ষিণে যে বাড়ীতে আমি কলকাতা এসে থাকতাম, তার বিপরীত দিকের ফুটপাতে সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীমান অনিল বাগচি আমায় ডেকে কথা কইলো। অনিলের সঙ্গে ছিল একটি ফর্সা রঙের তরুণ, সে যে আমার স্নেহের কালিকার

চতুর্থ কনিষ্ঠ সহোদর তা কে জানে। পরে শুনলাম, এর ডাকনাম "লায়ন" ভাল নাম "নির্মল"। অনিলের মুখে আমার পরিচয় শুনে তার তৃতীয় জ্যেষ্ঠ "অমলকে" আমার খবর দেয়।

একদিন অপরাহ্নে (মনে নাই—সেটা বেসপতিবার বা শনিবারের বারবেলা কি না) শ্রীমান অনিল (বারেন্দ্র) ও শ্রীমান নির্মল (মিত্র কায়স্থ) আমার বাসস্থানে গিয়ে আমাকে মিত্রজা মহাশয়ের ৪নং কার্তিক বোসের লেনের বাড়ীতে নিয়ে এলো। এসে দেখলাম অমলকে।

মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা"-এর অন্যতম গুণ বলে ধরা যেতে পারে। থানপাড় কাপড় পরে, ভদ্রতা, শালীনতা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাবার্তা কয়। ব্যবহারে একটুও চপলতা নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিকার সহধর্মিণী—শ্রীমতী পদ্মা, কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী উর্মিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে। আমার ভাগ্য-দেবতা বোধহয় তখন অন্তরাল হতে হেসে বল্ছিল—"কালিকার একটা বাঁধনের ওপর কতগুলো বাঁধন পড়লো—এ বাঁধন ছেঁড়া শক্ত হবে"। বাঁধন শিথিল হওয়া তো দূরের কথা—আমার ব্রাহ্মণী, ছেলেমেয়ে, ছেলের বউ সব যেন এদের কাছে বাঁধা পড়েছে। এরা যেন আমাদের কত জন্মের আত্মীয়। একটু আনুগত্যের পর বুঝলাম—অমলকে তার বয়সের অনুপাতে যে গম্ভীর মনে হতো, সেটা আমার ভুল। জ্যেষ্ঠ কালিকার অকাল মৃত্যুর পর সংসার পর্যবেক্ষণের ভার তার স্কন্ধে পড়ায় তার অবস্থা হয়েছে "কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার মত"। তার উপর তার আছে "পুথির নেশা"। পূর্বে বাড়ীতে বসেই বিহারের এক জমিদারের চাকরী করতো। যে টাকা পেতো তার অনেকাংশ "পুঁথি কেনায়" খরচ করতো। খুঁজলে আলমারিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী ও বাংলা বই এখনও পাওয়া যায়। আমাকে যতদিন হতে সে নিজের করে নিতে পেরেছে, ততদিন হতে প্রায় রোজই বলে—"দাঠাকুর, আপনার জীবনের ঘটনাগুলি কাগজে কলমে লিখে রাখুন, এটা

আমার অনুরোধ।” তার এই অনুরোধে আমি কোনদিনও কান দিইনি। দাসত্বের বাঁধন কাটার জন্য ব্যস্ত কালিকার ভাই অমল তার একমাত্র জীবিকা চাকরীর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে। অর্থোপার্জন অপেক্ষা আত্মসম্মান ও আত্মতৃপ্তিকে সে ঢের বড় বলে মনে করে। আমাকে যে অনুরোধ করতো, এবার সে তাই জুলুমে পরিণত করেছে। তারই জুলুমে আমি এই কর্মে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলাম।

আজ

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দা'ঠাকুর)

॥ দুঃস্থের আর্তনাদ বা দুষ্টের আত্মনাদ ॥

জেলা বীরভূম রামপুরহাট মহকুমার নলহাটী থানার এলাকায় ধর্মপুর নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। ধর্মপুর কাশিমবাজারের দানশীলা রাণী আন্নাকালী দেবীর মহালের অন্তর্গত। রাণীমা উক্ত ধর্মপুরের "পণ্ডিত" উপাধিধারী রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশের এক গৃহস্থকে গ্রামখানি পত্তনী বন্দোবস্ত দেন। পত্তনিদার হলেও সাধারণ প্রজারা পণ্ডিত মশায়দেরই জমিদার বলে মনে করতো। গ্রামের পত্তনী ছাড়া পণ্ডিতদের জমিজমা, পুকুর, বাগান প্রভৃতি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল।

প্রায় দেড়-শ বৎসর আগের কথা - পণ্ডিতরা তিন সহোদর একত্রে একান্নে বাস করতেন। জ্যেষ্ঠের নাম রামপ্রসাদ পণ্ডিত। মধ্যম ছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিত ও কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র পণ্ডিত। মধ্যম রামনারায়ণ অগ্রজ এবং অনুজের সঙ্গে একত্রে না থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ ঈশান একান্নেই রইলেন। রামপ্রসাদ বীরভূম জেলার সদর সিউড়িতে থেকে মোক্তারী করতেন। ঈশানচন্দ্র দাদার ভাই হয়ে বৃদ্ধাবস্থায়ও নাবালক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিত সিউড়িতে মোক্তারী করতে লাগলেন। ঈশ্বরের কনিষ্ঠ কালাচাঁদ জমিজমা ঘরকন্না দেখতেন। তাঁদের খুল্লতাত ঈশানচন্দ্র বড়দার ভাই যেমন ছিলেন, এখন ভাইপোদের ভাইপো হয়ে তেমনি নাবালকত্ব উপভোগ করতে লাগলেন।

ঈশানচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন তেজহাটী গ্রামের রঘুরাম চক্রবর্তীর কন্যা ইচ্ছাময়ীকে। ঈশানচন্দ্র যেমন কর্তা, ইচ্ছাময়ী তেমনি গিন্নী ছিলেন। সংসারের কোন ঝামেলা এঁদের স্পর্শ করতেও পারতো না। ইচ্ছাময়ীকে এতদিন চালিয়েছিলেন তাঁর বড় জা রামপ্রসাদের পত্নী

অর্থাৎ ঈশ্বর ও কালাচাঁদের মা। এখন তিনি ভাসুরপোয়েদের বউ দুটির আজ্ঞাধীনা। বউমায়েরা যা আদেশ করতেন, ইচ্ছাময়ী তাতে 'না' বল্‌তে জানতেন না। খিদে পেলে বউমায়েদের কাছে চাইতেন, কখনও নিজ হাতে কিছু নিতেন না। ইচ্ছাময়ী ঘর নিকোনো, সকড়ি ঘুচানো, বাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজই পছন্দ করতেন। বউমায়েরা যদি কোনদিন বলতেন—"আজ কাকীমা, আপনাকে রাঁধতে হবে।" ইচ্ছাময়ী কাতর কণ্ঠে উত্তর করতেন—"তোমরা নুন ঝাল দিয়ে দিয়ো মা, আমি আমার ঝাল দেব আর হাতা দিয়ে নাড়বো। খেতে ভাল না হলে, তোমাদের কাকা বকবে, ছেলেদের পেট ভরবে না।" সাদাসিধে খুড়ী-শাশুড়িকে বউ-মায়েরা মেয়ের মত যত্ন করতেন। এক কথায়—ইচ্ছাময়ী ছিলেন তাঁদের বউমা আর তাঁরাই ছিলেন শাশুড়ী।

॥ চিরদিন কভু সমানে না যায় ॥

এতদিন ঈশানচন্দ্র ও ইচ্ছাময়ীর কোন সন্তান জন্মে নাই। মোক্তার ভাইপো—ঈশ্বরচন্দ্র ও গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক ভাইপো—কালাচাঁদ কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে থাকতে কোন অমত করেন নাই। কিছুদিন পর ইচ্ছাময়ী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তার নাম রাখলেন প্রতাপচন্দ্র। এইবারে ভাইপোদ্বয়ের মধ্যে কানাঘুষা আরম্ভ হলো। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন—"এতো বয়সে ছোটকাকার ছেলে হবে তা ভাবতেও পারিনি, যদি বুঝতে পারতাম তাহলে—বাবা যা করেছিলেন, তা করেছিলেন, আমরা যে সব সম্পত্তি আমাদের আমলে কিনলাম, তা বড়ো বউ আর ছোট বউয়ের নামে কিনলেই ভাল করতাম"।

দুই ভাই পরামর্শ করে স্থির করলেন—কাকাকে পৃথক করে দিয়ে তবে সম্পত্তি বাড়ানো যাবে, একত্রে থাকতে আর নূতন জমিজমা কেনা ঠিক নয়। ছোট কাকা ছোট কাকীমা সোজা মানুষ, তাঁদের দ্বারা কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। একান্নবর্তী সংসারে স্বনামেই হোক

আর বেনামেই হোক বিষয়-সম্পত্তি কিনলেই কাকার ছেলেরা দাবি করতে পারে, যে দিনকাল পড়েছে, নিজেরা দাবি না করলেও আত্মীয়-পর পাঁচজনের পরামর্শে গোলমাল লাগানো বিচিত্র নয়। ঈশ্বরচন্দ্র মোক্তার, কাজেই আইনের প্যাঁচ তাঁর যথেষ্ট জানা আছে। তিনি ভাই কালাচাঁদকে একদিন বললেন—"কালাচাঁদ, আমি তো কাল সিউড়ি যাবো, তুমি কাকাকে ডেকে একদিন বেশ মিষ্টি করে বলো—ভবিষ্যতে কী হয়, কী না-হয়, কে বল্‌তে পারে, আপনি থাকতে থাকতে পৃথক হওয়া ভাল"। কালাচাঁদ দাদাকে উত্তর দিলেন—"তুমি বড় থাকতে কী আমার ছোট মুখে ওকথা বলা সাজে? তুমি আইন জানো, কানুন জানো, কাকাকে আজ খাবার সময় বেশ ঠাণ্ডা করে বুঝিয়ে বলো। তুমি যা বোঝাবে কাকা তাই বুঝবেন। তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন তিনি। সেদিন ভট্‌চায্যি জ্যাঠার কাছে তোমার কত প্রশংসা করেছিলেন—'ঈশ্বর পূর্বজন্মে আমার বাবা ছিল, ওর জন্যে আমি দাদার অভাব একটুও বুঝতে পারিনি'।" কথাটা শুনে, মোক্তার ভাইপোর মুখখানি যেন কালো হয়ে গেল, কপাল কুঁচ্‌কে গেল। একটু ভেবে কালাচাঁদকে বললেন—"আচ্ছা, যেমন চলছে চলুক এখন, পুজোর পর যা-হয় করা যাবে।"

আসল কথা হচ্ছে—ঈশানচন্দ্রের সরলতার কাছে ভাইপোদের কপটতার প্যাঁচ ঘেঁষতে ইতস্ততঃ করছে। ঈশ্বরচন্দ্র মনে করছে—পৃথক হবার সাংঘাতিক কথাটা কালাচাঁদ কাকাকে বলুক। কালাচাঁদ ভাবছে—কাকার কাছে আমি একথা বলে, পাপের ভাগী হতে যাব কেন? বলতে হয় তো দাদাই বলুক না কেন? ভাইপোদের ধর্ম-বুদ্ধি আর পাপবুদ্ধির ঠেলা-ঠেলিতে আরো বছর-দুই কেটে গেল। ইচ্ছাময়ী আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তার নাম হলো হেমচন্দ্র। মোক্তার ঈশ্বরচন্দ্রেরও একটি পুত্র জন্মাল—তার নাম রাখা হলো কুলদাপ্রসাদ। ইচ্ছাময়ী তাঁর ছেলেদের জন্য দুধ বউমাদের কাছে চেয়ে নেন। কখনও নিজ হাতে দুধের কড়াই হতে কেউ তাঁকে দুধ

নিতে দেখেনি। রাত্রে প্রদীপ জ্বালার জন্য তেল বউয়েরা মনে করে দেয় তো তাঁর শোবার ঘরে প্রদীপ জ্বালেন, নইলে আঁধারেই আন্দাজে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বিছানা পাতেন। স্বামী ঈশানচন্দ্র যেমন 'নিজবাসভূমে পরবাসী'র মতো ভাইপোরা যা করে তাতেই রাজী, ইচ্ছাময়ীও বউমায়েরা যা করে তাতে 'না' বলতে জানেন না।

ইচ্ছাময়ীর বড় ছেলে প্রতাপচন্দ্র হঠাৎ জ্বর হয়ে মারা গেল। পুত্র শোকাতুরা জননী চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলেন। ঈশানচন্দ্র স্ত্রীর সরলতা জানেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া খুব সহজ হবে এ বিশ্বাস তাঁর আছে। তিনি রোরুদ্যমানা পত্নীকে বললেন—"ভগবান ছেলে দিয়েছিলেন, তিনিই ফেরত নিলেন এতে কাঁদতে নেই, কাঁদো যদি ভগবান রাগ করবেন।" ভগবান রাগ করবেন—এই ভয়ে ইচ্ছাময়ী সারা জীবনে প্রতাপচন্দ্রের জন্য একদিনও চোখের জল ফেলেন নি। হেমচন্দ্রকে বুকে করে' প্রতাপের শোক একেবারে ভুলেছিলেন।

ঈশানচন্দ্রের ভাইপোরা আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। মোক্তারীর আয়, সম্পত্তির আয় সবই তাঁদের হাতে। কাকা খান আর বেড়ান। কুলদার ছেঁড়া কাঁথা, তার পুরানো ছিটের আঙরাখা হেমচন্দ্রকে বড় বউমা দিলে ইচ্ছাময়ীর আনন্দের বহর দেখে কে! হেমকে সেই পুরানো আঙরাখা পরিয়ে পাড়া বেড়িয়ে আসে। সবাইকে বলে—"হেমার বড় ভাজবউ এটা ওকে দিয়েছে। বউমায়েরা খুব ভাল—হেমাকে ভালবাসে কতো।" পাড়ার লোকেরা মনে মনে হাসে, আর নিজেদের মধ্যে বলে—তোমার কপাল। একেই বলে—কানা কুকুর মাড়ে সন্তোষ। পাগলীর মনে কত অল্পে আনন্দ হয় দেখেছিস—ছোট পণ্ডিত বলেছে যে, ছেলের জন্য কাঁদো তো ভগবান রাগ করবেন। মন এমন সোজা যে, একবারও অমন কার্তিকের মতো ছেলে—প্রতাপের নাম পর্যন্ত করে না!

দেখতে দেখতে ৫/৬ বৎসর কেটে গেল। ঈশানচন্দ্রের ভাইপোরা

আর কতদিন ধৈর্য ধরে থাকবে? একদিন দুই ভাই একত্রে কাকাকে ডেকে বলে ফেললেন—"কাকা, আমরা পৃথক হবো মনে করেছি। আমরা রোজগার করি, সেই টাকা দিয়ে সম্পত্তি কিনবো, আপনার ছেলে তো তার ভাগ ছাড়বে না। আপনি থাকতে থাকতে ভাগ করে নিন।" কথাটা ঈশানচন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাতের মতো নিদারুণ বলে মনে হলেও, তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর করলেন—"দাদার পরলোকের পর তোরাই সব চালাচ্ছিস বাবা, আমি তোদের পুষ্যির মতো খাই আর বেড়াই, আমাকে পৃথক করে দেওয়া কি ভাল হবে বাবা? তোরা লেখাপড়া জানিস, কাকার চেয়ে কি বিষয় বেশি আপনার? কাকা মরে গেলে ভাইপোরা কাকা বলে কাঁদে—ওরে আমার কাকা কোথায় গেল বলে, কাকার সব গুণ বলে আর শোক করে। পুকুর, বাগান, জমিজমা—এসব নষ্ট হলে, আমার বাগান রে! ওরে আমার বাদশাভোগ আম রে! ওরে আমার পুকুর রে! ওরে আমার রুই মাছ রে! ওরে আমার কাৎলা মাছ রে! বলে তো কেউ কাঁদে না বাবা। আমাকে পৃথক করে দেওয়া আর কুলদাকে পৃথক করে দেওয়া একই সমান।" এমন করে বলাতেও ভাইপোদের মন নরম হলো না। ভাইপোরা কাকাকে শেষ কথা শুনিয়ে দিলেন—"কাল থেকেই হাঁড়ি পৃথক হোক। আপনারা বাইরের ঘরে রাঁধুন। তারপর লোকজন ডেকে ধানের গোলা জমিজমা সব ভাগ করা যাবে।"

ইচ্ছাময়ীকে বউমায়েরা চাল, ডাল সব বের করে দিয়ে বললে—"কাকীমা, আপনি বাইরের ঘরে যে আখা (উনান) আছে, তাতেই রাঁধুন। কাকা, আপনি আর হেম সেখানে খাবেন। এই নিন—চাল, ডাল, নুন, তেল আর বড়ি। ঘরে যা ছিল তা দিলাম। এরপর চাল ডাল পাবেন, নুন তেল তরকারী আপনাদের কিনে আনতে হবে।" ইচ্ছাময়ী অবাক হয়ে, তাদের মুখপানে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন—"বউমা, আমি তো কোন দোষ করিনি মা! তবে কি হেমা কিছু

করেছে মা? ও যদি কিছু করে থাকে ওকে ধরে মারো, আমি কিছু বলবো না।"

সেদিনও ইচ্ছাময়ী সংসারের বাইরের সব কাজ করেছেন। বউ-মায়েদের দেওয়া চাল ডাল বাইরের ঘরে নিয়ে এসে স্বামীকে বললেন —"আমি বউমায়েদের কিছুই দোষ করিনি, তাও আমাকে রেঁধে খেতে বল্লে। আর আমাকে ওরা ওদের রান্না খেতে দেবে না।" ঈশানচন্দ্র একটু হেসে স্ত্রীকে বল্‌লে—"বেশ, তুমি রাঁধো এখন হতে। অন্নপূর্ণার রান্না আমার অদৃষ্টে লিখেছেন বিধাতা তা কে ঘুচাবে!" ইচ্ছাময়ী স্বামীর কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"অন্নপূর্ণা কে? সে কবে আসবে, এলে আমি বাঁচি। যতদিন সে না আসে আমি ভাত ক'টা রেঁধে দেব। ডাল তরকারিতে নুন ঠিক হবে না, বউ-মায়েদের তুমি বল্লে ওরা তোমার মত একটু ডাল তরকারি দিলে, তুমি আর হেমা তাই দিয়ে খাবে।" ঈশানচন্দ্র এত বিপদেও এই সরলপ্রাণা পল্লীনারীর কথায় রাগ না করে বললেন—"দেখ ছোট বউ, আজ আমি ডাল তরকারি রাঁধছি তুমি বসে বসে দেখ। আমার, তোমার আর হেমের মতো চালের মাপ, ডালের মাপ শিখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে, একটি ছোট বাটির চারবাটি চাল নিলেন। ইচ্ছাময়ী বসে বসে দেখতে লাগলেন। আজকালকার ভাষায় বলতে হলে বলতে হয়—রান্নার 'ট্রেনিং' নিতে লাগলেন। চার বাটি চালে কতখানি জল দিতে হবে তার মাপ একটা ভাঁড় ঠিক করে দিলেন। ডালের মাপ চালের মাপের বাটির এক বাটি আর জল একটা ছোট ঘটির এক ঘটি দেখিয়ে দিলেন। ডালে কেমন একটু হলুদ বাটা দিতে হবে তাই হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন—"নুন তোমাকে দিতে হবে না। আমি এসে রাঁধা ডালে নুন মিশিয়ে দেবো। তুমি খানিকটা নুন গুঁড়ো করে রেখো। তরকারি রাঁধতে হবে না, —তেঁতুল চট্‌কিয়ে তাতে একটু নুন তেল দিয়ে ভাত বেশ খাওয়া যাবে। খুব আকাশ-পাতাল ভেবো না। খিদের মতো তরকারি নাই।"

ইচ্ছাময়ীর আজ আনন্দের সীমা নাই—সে ছোট পণ্ডিতের কাছে রান্না শিখে ফেলেছে। স্বামী যেমন শিখিয়ে দিয়েছেন, পরদিন তেমনি করে ভাত আর ডাল রেঁধে স্বামীর আশা পথ চেয়ে বসে আছেন। হেম খিদেয় কাঁদতে লাগল—"মা খিদে পেয়েছে, আমাকে ভাত দাও।" মা তখন ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন—"তোর বাবা এসে ডালে নুন দেবে তবে তো খাবি। ডালে নুন নেই খাবি কি করে? আচ্ছা বোকা ছেলে তুই।"

ঈশানচন্দ্র ভাগে এক গোলা ধান পেয়েছিলেন। গোলা বললাম, কিন্তু গোলা বলা ঠিক হলো না। বিচালির রশি বা মোটা দড়ি পাকিয়ে, তাই দিয়ে এক রকম ধানের মরাই তৈরি হয়, তাকে ধর্মপুর অঞ্চলের লোক বলে ধানের উলা। তিনি এক উলা ধান যা ভাগে পেয়েছিলেন, যারা ধান ভানে চাল তৈরি করার জন্য তাদের ডাকতে গিয়েছিলেন। তারা বৈকালে আসবে বলেছে। বাড়ি ফিরে এসে স্নান করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মতো ডালে নুন মিশিয়ে নিলেন। তেঁতুল ভিজিয়ে রেখেছিলেন ইচ্ছাময়ী। ঈশানচন্দ্র তাকে চট্‌কিয়ে কাঁইবিচি ও ছিব্‌ড়েগুলি ফেলে দিয়ে, নুন তেল দিয়ে মেখে নিলেন। দুই এক গ্রাস খেতেই ইচ্ছাময়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"রান্না কেমন হয়েছে?" ঈশানচন্দ্র একগাল হেসে উত্তর দিলেন—"সুন্দর! চমৎকার!" ইচ্ছাময়ী জীবনে কখনও এত আনন্দ পান নি। স্বামীকে সব ভাত ক'টি নিঃশেষ করে খেতে দেখে বলে উঠলেন—"দেখ, আমাকে তো কেউ কখনো রান্না শেখায়নি। তুমি শিখিয়ে দিলে তাই তো রাঁধতে পারলাম। রাঁধতে রাঁধতেই আরো ভালো হবে।"

স্বামীর খাওয়া হলে তাঁর থালাতে নিজের ভাত ক'টি বেড়ে নিয়ে, খেতে শুরু করবে এমন সময় কালাচাঁদের বউ এসে হাজির। তাঁর আসার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—কাকীমা কি ছাইপাঁশ রেঁধেছে তাই দেখে সকলের কাছে গল্প করবে। ছোট বউমাকে দেখে ইচ্ছাময়ী বলে উঠলেন—"দেখ মা কোন্ সকালে রান্না করেছি, তোমার কাকা

খেতে দেরি করলেন, তাই এত বেলা হলো খেতে।" উনি খেয়ে বললেন—"রান্না খুব সুন্দর হয়েছে।"

ভাত ক'টি খেয়ে, ইচ্ছাময়ী হেমকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় বেরুলেন, যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সম্পর্ক ধরে ডেকে বলেন—"আজ আমি রান্না করেছি, ছোট পণ্ডিত খেয়ে, রান্না খুব ভালো হয়েছে বললেন। সব খেয়েছেন, কিছু পাতে ছিল না।" পাড়াময় নিজের রান্নার সুখ্যাতি করে ইচ্ছাময়ী সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরলেন।

ঈশানচন্দ্র ধানভানা লোক রাখাল মালকে উলা হতে ধান বের করে নিতে বললেন। রাখাল এক ধামা ধান নামিয়ে, আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল—"এরাই আবার ব্রাহ্মণ! ভদ্দরলোক! কর্তাঠাকুর; আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে আপনার ভাইপোরা ধানে আর্ধেকের উপর পাতান (চালবিহীন চিটে) মিশিয়ে, সেই উলাটা আপনার ভাগে দিয়েছে। কর্তাঠাকুর, তুমি সইবেন, কিন্তু ভগবান সইবে না। হায়রে কলিকাল! কোলেপিঠে করে যাদের মানুষ করলে, তারাই তোমার গলায় ছুরি দিলে কর্তাঠাকুর! তুমি গাঁয়ের ভালোমানুষ ভদ্দর পাঁচজনকে ডাকো, তারা দেখুক এই যে তোমার ছোট ভাইপো—কালাচাঁদ ঠাকুর! বল্লে ছোট মুখে বড়ো কথা বলা হয়! ওর চোখে চামড়া নাই। কথায় বলে—'কালো বামুন কটা সুদ্দুর বেঁটে মুসলমান। ঘর-জামাই আর পুষ্যি-পুত্তুর, সব বেটাই সমান।' কর্তাঠাকুর, তুমি হাতে পৈতে নিয়ে ওদের শাপ দাও, দেখবে তেরাত্তির পেরুবে না, চলে যাবে। এখনও চন্দর-সুয্যি উঠছে—দিন রাত হচ্ছে।"

ঈশানচন্দ্র অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন। গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন—ছোঁড়ারা এতো নীচে নেমেছে! বড়দা তো এমন ছিলেন না! তবে কেন এরা এমন হলো। রাখালকে ধামার ধান মরাইয়ের মধ্যে ঢেলে দিতে বলে তামাক সাজতে লাগলেন। এমন সময় পাড়ার

ভিখারী ভট্চায্যি মশায় এসে ঈশানচন্দ্রকে বললেন—"ছোটদা, আপনার ভাইপোরা আপনাকেই ভাইপো বানিয়েছে। শুনেছেন—যে জমি আপনার ভাগে দিয়েছে, তার তিন বছরের খাজনা বাকি রেখেছে। জমিদার তো খাজনা তামাদি করবে না, এইবারেই বাকি খাজনার নালিশ রুজু করে দেবে। অত টাকা আপনি পাবেন কোথা? আপনার ভাইপোদের টাকা আছে। এই সব জমি নীলামে উঠলেই ওরা ডেকে নেবে। ফলে, সব জমিই ওদের হবে। আপনার হেমকে ভিক্ষে করে খেতে হবে।"

ঈশানচন্দ্র কিছুক্ষণ ভেবে আর কুল কিনারা না পেয়ে, আগামীকাল অতি প্রত্যুষে, সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গাতীরে পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাড়ি দফরপুর গ্রামে ইচ্ছাময়ী ও হেমচন্দ্রকে নিয়ে জীবনের মতো যাবার সঙ্কল্প করলেন। মোক্তার ভাইপো ঈশ্বরচন্দ্র কাকাকে পৃথক করে দিয়ে মোক্তারি করতে সিউড়ি গিয়েছেন। কালাচাঁদ বাড়িতেই আছেন। রাত্রি তিন প্রহর অতীত হতে না হতেই ঈশানচন্দ্র স্ত্রী ও পুত্রের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের দুজনকে তাঁর অনুসরণ করবার নির্দেশ দিলেন। স্বামীর কথায় ইচ্ছাময়ী হতভম্ব হয়ে বলে উঠলেন—"অনেক রাত আছে, এখন কোথা যাবে?"

ঈশানচন্দ্র তাঁকে বললেন—"গঙ্গাস্নান করতে যাবো তোমার দিদির বাড়ি—দফরপুর।"

ইচ্ছাময়ী শুনে ভারি খুশি। গঙ্গাস্নান করলে যে পুণ্য হয় এ জ্ঞান তাঁর না থাকার নয়। তার উপর দিদির বাড়ি যাবে। দিদির কাছে বুড়ো মা থাকেন। দিদির নাম মুক্তকেশী। ছোট বোন সহচরীর সঙ্গে মুক্তকেশীর দেওরের বিয়ে হয়েছিল। দিদি ও বোন দুজনেই বিধবা। দিদির রাসবিহারী নামে এক ছেলে আছে। এদের সবাইকে কতদিন দেখেনি। গঙ্গাস্নানও হবে, এদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হবে। তার উপর দফরপুরে যে কয়দিন থাকবে রন্ধনশালায় ঢুকতে হবে না। চাল

ডাল মাপা আর জল মাপার হাত থেকে রেহাই পাবে। পাকা রাঁধুনী ইচ্ছাময়ীর পক্ষে এটাও কম আনন্দের কথা নয়। হেমের ঘুম ভাঙিয়ে বড় বউমার ছেলে কুলদার পরিত্যক্ত ছিটের আংরাখা তার গায়ে পরিয়ে দিলেন। ইচ্ছাময়ী আবার সন্তানসম্ভবা। দফরপুর ধর্মপুর হতে ১৯ মাইল দূর। পথে খিদে পেলে হেমই বা খাবে কি! আর সে নিজে পোয়াতি মানুষ, খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। পেটে যেটা এসেছে, তাকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঘরে চিঁড়ে কি মুড়ি কিছুই নাই। তাঁর স্বামী ঈশান পণ্ডিত মশায়, চোখে মুখে জল দিয়ে পৈতৃক ভিটায় শেষ ছিলিম তামাক খেতে লাগলেন, আর আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

ইচ্ছাময়ী আস্তে আস্তে বড় বউমার ঘরের দরজায় গিয়ে কপাটে ঠুক ঠুক করে ঘা।দতে লাগলেন। ছোট বউমার ঘরে কালাচাঁদ আছে সেই জন্য তার ঘরে যেতে সমীহ হলো। বড় ভাসুরপো সিউড়িতে আছে, সেই জন্য বড় বউমাকে ডাকতে সাহস করলেন। বড় বউমা জেগেই ছিলেন। ছোট কাকা আর কাকীমা যে দফরপুর যাবার উদ্যোগ করছেন, তাও তাঁদের দুই জা-এর অজানা ছিল না। সন্ধ্যার সময় রাখালের পাতান মিশানো ধান নামানোর কথা, আর ও-বাড়ীর ভিখারী কাকার মুখে বাকী খাজনার কথা সব তারা শুনেছে। ছোট বউকে বড় বউ সাবধান করে দিয়েছে—ঠাকুরপোকে যেন সে এসব কথা না বলে। ছোট কাকা আর কাকীমার মতো সাদাসিধে মানুষের থাকার স্থান এ বাড়ী নয়। তাঁরা গঙ্গাতীরেই যাবেন—বোধহয় ভগবানের ইচ্ছাও তাই। বড় বউমা কেবল ভাবছেন—স্বামী ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধে তাঁর ছেলে কুলদার অকল্যাণ না হয়। কাকীমা ডাকবামাত্র বড় বউমা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একপাট রুপোর কঙ্কণ হাতে ক'রে। কাকীমার বাঁ হাতে তা পরিয়ে দিয়ে বললেন—"কাকীমা, আমার শাশুড়ী মরণকালে আমাকে কঙ্কণ-জোড়া দিয়ে বলেছিলেন—এ কঙ্কণ তাঁর শাশুড়ির হাতের; একপাট তাঁর প্রাপ্য

আর একপাট আপনার। তিনি আমায় বার বার করে বলেছেন— এটা তোমার কাকীমাকে দিয়ো। জ্ঞাতিকে বঞ্চিত করে কিছু নিলে তার কোন কালে প্রতুল হয় না।” অন্য সময় হ’লে ইচ্ছাময়ী এই একপাট কঙ্কণ হাতে দিয়ে পাড়াময় ঘুরে সবাইকে দেখিয়ে বড় বউমার দান-শক্তির সুখ্যাত করে আসত। রাস্তায় খাবার কিছু নাই, তাই কঙ্কণ হতে দু-মুঠো মুড়িই তাঁর কাছে মূল্যবান বলে মনে হল। ইচ্ছাময়ী কঙ্কণ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে কাতর স্বরে বড় বউমাকে বললেন, “মা, আমরা দফরপুর দিদির বাড়ি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি হেমার আর আমার রাস্তায় খাবার মতো দুটি মুড়ি দেবে মা?”

ছোট কাকা যখন কাকীমাকে দফরপুর যাবার কথা বলেন, বড়-বউমা তখন বাইরে বেরিয়ে তা শুনতে পেয়েছিলেন। ওদের ঘরে যে পথে-খাবার মতো কিছু নাই, তাই ভেবে, ঘরে এসেই তিনি একটা ন্যাকড়ায় মুড়ি-মুড়কী, চিঁড়ে, গুড়ের পাটালি বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁরা যখন বাড়ি হতে বেরুবেন তখন কাকীমার হাতে দিয়ে ওঁদের পায়ের ধূলো নেবেন বলে জেগে ছিলেন, ঘুমোন নি। মুড়ির পোঁটলাটা কাকীমার হাতে দিয়ে তাঁর পায়ের উপর উপুড় হ’য়ে পড়ে, কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—“কাকীমা, আমি তো ছোট কাকার সামনে কখনও কোন কথা কইনি, (তখন শ্বশুর খুড় শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সামনে কথা বলা কুলবধূদের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল) আজ দুটো কথা কইবো।” এই বলে, ঈশ্বানচন্দ্র যে স্থানে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, সেইখানে কুলদাকে কোলে নিয়ে এসে ছোট কাকার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন—“কাকা, আমায় ৮ বছরের মেয়ে বিয়ে দিয়ে আপনি এ-বাড়ীতে এনেছিলেন। আমার কোন অপরাধ নেই কাকা, আমার কুলদার যেন কোন অকল্যাণ না হয়।” ঈশানচন্দ্র বড় বউমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—“কারো কোন দোষ নেই মা, যত দোষ আমার অদৃষ্টের। আমি গঙ্গাতীরে যদি থাকতে স্থান না পাই আবার ফিরে আসব,

না—হতভাগার সুখ বৈকুণ্ঠেও নেই। কালাচাঁদকে একটু ডেকে দাও না মা। যাবার সময় ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়ে যাবো।"

কাকা ডাকছেন শুনে কালাচাঁদ উঠে এলো। ছোট বৌমাও ছোটকাকা আর কাকীমাকে শেষ প্রণাম জানতে অপরাধিনীর মতো স্বামীর পেছন পেছন এলো। কালাচাঁদ আসবামাত্র কাকা তার হাতে ঘরের চাবি দিয়ে বললেন—"বাবা কালাচাঁদ, ঈশ্বর সিউড়িতে আছে, তোমাকেই বলে যাচ্ছি, তুমি তাকে বলো—আমি তোমাদের সম্পত্তির ভাগ নেবো না। আমি, তোমার কাকীমা আর হেমকে নিয়ে অন্যত্র যাচ্ছি। জমিজমা ধান-পান সব তোমাদের থাকল।"

কথাটা শুনবামাত্র কালাচাঁদ একটু গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—"কোথা যাচ্ছেন?"

কাকা উত্তর দিলেন—"যেখানে স্বজন পাবো।"

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের চেয়ে স্বজন সেখানে কে আছে আপনার?"

কাকা উত্তর দিলেন—"সেখানে যিনি আছেন, তিনি একা আমার স্বজন নন, সকলেরই স্বজন তিনি। তিনি হচ্ছেন—পতিত পাবনী মা গঙ্গা। তাঁর শরণাগত যে হয়, সে অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হউক, মা বুক পেতেই আছেন, সবাইকে বুকে স্থান দেবার জন্য। স্বজনে যাকে অবহেলা করে, তিনি তাকেও কোলে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।"

এই কথা শুনে' কালাচাঁদ একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বললেন—"এ আপনার গঙ্গাতীরে যাওয়া নয়, দেশময় আমাদের একটা কেলেঙ্কারী রটাবার মতলব। লোক-সমাজে আমাদের এই দুর্নাম রটালেন যে—কাকাকে এরা দুই ভাইএ দেশছাড়া করলে। ভগবান জানেন—যাকে চুল-চিরে ভাগ করা বলে, আমরা তাই করে দিয়েছি। গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আপনি বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবধান কিছু করেছেন কি?"

ঈশানচন্দ্র যাবার সময় আর বেশি কিছু না বলে চণ্ডী মণ্ডপ আর গোপালদেবের ঘরে প্রণাম করে, ইচ্ছাময়ী আর হেমচন্দ্রকে নিয়ে পথে বাহির হলেন।

কালাচাঁদ কাকা বা কাকীমাকে একটা প্রণামও করলেন না। বড় বউমা আর ছোট বউমা তাঁদের পায়ের ধুলো নিলেন। বড় বউমা ছোট বউমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—"দেখ বোন, ছোট কাকা, কাকীমা আর হেমকে নিয়ে যখন বাড়ি হতে বেরিয়ে গেলেন, তখন আমার মনে হলো যেন মহাদেব মা দুর্গা আর কার্তিককে নিয়ে, পণ্ডিতদের বাড়ি হতে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। এ বাড়ির আর মঙ্গল নেই। ছোট কাকা আর কাকীমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মতো মহাপাপ কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ছোট কাকা ক্ষেপাও নন বোকাও নন। রীতিমত লেখাপড়া জানেন। ক'দিন আগে তোমার ভাসুর এক মক্কেলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তার কতকগুলো ফার্সি দলিল ছোট কাকাকে দিয়ে বাংলা করিয়ে নিলে। লোকটা পাঁচটি টাকা ছোট কাকার হাতে দিতে গেল, ছোট কাকা নিলেন না। বললেন—কতক্ষণের বা কাজ, এর জন্যে কিছু দিতে হবে না। ছোট কাকা এই কথা বলে উঠে গেলেন। উঠে যেতেই তোমার বড় ঠাকুর, লোকটার কাছে কাকার মেহনতির পাঁচ টাকা আর নিজের ফি দু' টাকা এই সাত টাকা নিলেন, তবে ছাড়লেন। ছোট কাকা গৃহী সন্ন্যাসী। গঙ্গাতীরে গেলেন, আজও গেলেন, কালও গেলেন। আর ফিরবেন না।

ছোট বউ—"দিদি, ছোট কাকা কী ছোট কাকীমার পুঁজি তো কিছু নেই। ওঁদের দিন যাবে কি করে দিদি?"

বড় বউ—"জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। আমরা ভেবে কি করবো বোন; যাদের কোলে বুকে নিয়ে মানুষ করেছেন, সেই ভাইপোরাই ওঁদের কথা একটুও ভাবলো না। আমরা মেয়ে মানুষ, কিছু বলতে গেলেই দাঁত খিঁচুনি খেতে হবে। ঠাকুরপো

বলবেন, উনিও বলবেন—মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতন থাকো, আমাদের উপর কথা কয়ো না। কাজেই ভাই, আমাদের চুপ করে থাকাই ভাল। এতক্ষণে ওঁরা ব্রাহ্মণী নদী হয়ত পেরোলেন।"

দুই জা-এ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে সকালবেলার বাকী কাজে মন দিলেন।

কালাচাঁদ শয্যা ত্যাগ করে, হাত মুখ ধুয়ে বড় বউ-এর কাছে এসে বলতে শুরু করলেন—"দেখ ভাজ-বউ ; (এ অঞ্চলে, সেকালে বড়-ভাই এর স্ত্রীকে 'ভাজ-বউ' বলতো) ছোট কাকা চলে যাওয়ায় আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। উনি কাজের মধ্যে কাজ করতেন—চণ্ডী মণ্ডপে মা-দুর্গার বেদীতে রোজ দু'পাতা করে বিল্বপত্তর দিতেন আর নারায়ণ আর গোপালকে দু'পাতা করে তুলসী দিতেন, সেই কাজটা এখন আমাকেই করতে হবে দেখছি। ছোট কাকী ঘরদোরগুলো নিকোতেন, আর বাসন-কোশনগুলো ধোওয়া-মাজা করতেন, এঁটো-সকড়িটাও ঘুচোতেন। একটা ছোটলোকের মেয়ে চাকরাণী রাখলেই সে কাজ হয়ে যাবে। ওঁদের তো পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল, চাকরাণী রাখতেই হতো। —রাজা গেলে রাজ্য চলে, আর ওঁরা গেছেন বলে কিছু অচল থাকবে নাকি ; হ্যাঁঃ।"

একটু বেলা হতে না হতেই ধরমপুরের ভট্চায্যিদের বৈঠকখানায় স্থানে স্থানে তামাকের আড্ডায়, মেয়েদের মজলিসে, স্নানের ঘাটে কেবল একই আলোচনা -"ছোট পণ্ডিত ভাইপোদের ভক্তির চোটে দেশত্যাগ করলে হে ; কেউ কেউ বলে উঠল—ওই যে ছোট পণ্ডিতটি, সামান্য লোক মনে করো না, আমার বাবার বয়সী লোক তিনি, তবুও মনে হতো যেন বালকটি। হেমার বড় প্রতাপ যখম মারা গেল, এক কথায় কাকীমার কান্না থামিয়ে দিলেন। নিজে মন্তর পড়ে নিজে হাতে ছেলের মুখে আগুন দিলেন। চোখে একফোঁটা জল পড়ল না ! আমি তো ছোঁড়াটাকে দাহ করতে শ্মশানে গিয়েছিলাম। ছেলেটা পুড়ছে, পণ্ডিত কাকা ঠায় চিতার কাছে বসে গান গাইছেন—

সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে—
করি আমি।"

আর একজন বলে' উঠল—"ওঁর বড়দাদা রামপ্রসাদ পণ্ডিত যা করেছেন, উনি তাতে কখনো একটি কথা কন নি। আবার দাদার মৃত্যুর পর ঈশ্বর, কালাচাঁদ যা করেছে, কখনও ডাল তুলে ফল দেখেনি। আরে, যেমন দেবা, তেমনি দেবী। হেমের মা যেন সত্য-যুগের মেয়ে। বউরা যখন যা বলেছে—ঝি চাক্‌রাণীর মতো তাই করেছে। সাতে হুঁ পাঁচেও হুঁ। কখনও কারো কথায় 'না' বলতে শুনিনি।"

অমনি আর একজন বলে উঠল—"ঈশান পণ্ডিতকে তোমরা তো জানো না—উনি সাধক লোক—তা না হলে জীবনে স্বার্থ কাকে বলে জানে না। পণ্ডিতদের কিসের অভাব ; আজ শুধু হাতে, সব ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণী আর ছেলেটিকে নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে ক'জন যেতে পারে হে ; উনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। যাকে যা বলে তাই হয়। হারু নাপ্‌তের ছেলে ন'কড়িকে জানো তো? সেবার ওকে তুলসী তলায় নামিয়েছিল। হারুর বউ ছোট পণ্ডিতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পা তুখানিতে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললে—কর্তাঠাকুর, আমার ন'কড়িকে আশীর্বাদ করো যেন বেঁচে ওঠে। ন'কড়ি ছাড়া আমার কেউ নেই। মায়ের চোখের জল পণ্ডিতের পা তুখানিকে ভাসিয়ে দিলো। বলবো কি ভাই, ঈশান পণ্ডিত নিজের কপালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন—যা! কাঁদিস না নাপিত-বউ, তোর ন'কড়া বেঁচে উঠবে। আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা! ন'কড়ি বেঁচে উঠল, সাতদিনের মধ্যে পণ্ডিতের জলজ্যান্ত ছেলে প্রতাপ মায়ের কোল খালি করে চলে গেল। জানো না, সাধুরা নিজের গায়ে পরের পাপ নিয়ে পরের ভাল করে। ঈশান পণ্ডিতকে ধর্মপুরের লোক চিনতে পারেনি। আজ ধর্মপুরের 'ধর্ম' চলে গেল, থাকলো শুধু

পুর। আমি বলে রাখলাম—দেখো, ঈশ্বর পণ্ডিত আর কালাচাঁদ পণ্ডিতের কি হয়।" সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে কালাচাঁদকে আসতে দেখে আলোচনা থেমে গেল। যে যার বাড়ি-মুখে রওনা হলো।

।। পথের সহায় ।।

গ্রামের বাইরে অশ্বত্থ গাছের নীচে তেল সিঁদুর-মাখা শিলামূর্তি গ্রাম্য দেবতার সামনে প্রণাম করে পত্নী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ গ্রাম ত্যাগ করে চললেন। মনে তাঁর দারুণ চিন্তা—অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আর ৫/৬ বৎসরের ছেলেটি দীর্ঘ ১৯ মাইল পথ পদব্রজে কি একদিনে যেতে পারবে? পথিমধ্যে সন্ধ্যা হলে আবার কোথায় আশ্রয় নেবেন! মাইল ২ পথ চলেই করযা গ্রামে প্রবেশ করবামাত্র গ্রামের মুসলমান জমিদার করযার বড় মিঞার সঙ্গে দেখা হলো তাঁদের।

ছোট পণ্ডিত মশায় ভাগে পাতান মিশানো ধান আর খাজনা বাকি পড়া জমি পেয়েছেন—একথা একবেলায় গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। করযার বড় মিঞা সাহেবও একথা শুনেছেন। সকালবেলার নামাজ শেষ করে মসজিদ হতে নামতেই—পণ্ডিত মশায় তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পদব্রজে আসতে দেখে বড়মিঞা জিজ্ঞাসা না করেই অনুমান করে নিলেন—ধর্মপুরে স্বজনের ধর্মজ্ঞানের চোটে ব্রাহ্মণ সপরিবারে দেশত্যাগ করে বোধহয় গঙ্গাতীরে বাস করতে চলেছেন। তিনি নিকটে আসতেই মিঞা সাহেব কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠলেন—"আদাব কাকাঠাকুর, আদাব। কাকীমা আর ভাইকে নিয়ে আমাদের ছেড়ে চললেন বুঝি? যাবার সময় আমার একটা আব্দার রাখতে হবে কাকাঠাকুর।"

পণ্ডিত মশায় তাকে প্রতি আদাব জানিয়ে তাঁর স্বভাব সুলভ হাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করলেন—কি আব্দার বাপজান?"

বড়মিঞা সাহেব তখন জোড়হাত করে বলতে লাগলেন—

"আপনি গরুর গাড়ি চড়েন না তা জানি। আমার মহিষের গাড়ি আছে, গাড়োয়ান গাড়ি চালাবে। কাকীমা ভাইকে নিয়ে আপনি যদি ভাতিজার এই গাড়িতে চড়ে যান তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। ভাতিজার এই ছোট্ট আব্দার কি কাকার কাছে থাকবে না?"

বড়মিঞার আব্দার শুনে পণ্ডিত মশায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যেন তাঁর অজ্ঞাতসারে বলে ফেললেন —"খোদা দেনে বালা রে মওলা দেনে বালা। বাপজান, তোমার করযা গ্রামে ঢুকবার আগেই আমি ভাবছিলাম—এই শিশু আর তোমার কাকী ১৯ মাইল পথ চলবে কি করে! তুমি বোধহয় তখন খোদার ভজনা করছিলে মসজিদে। তুমি তোমার কোমল হৃদয়ের জন্য এই আব্দার করছো, না খোদার ভজনে তন্ময় অবস্থায় তাঁর আদেশ পেয়ে, আব্দারছলে আমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছো?"

বড়মিঞা উত্তর দিলেন—"কাকাঠাকুর, আপনি তো প্রায় গান করেন—তোমার কর্ম তুমি করো, লোকে বলে করি আমি। তিনি আপনাকে জানেন। আমার এ আব্দার জন্মিয়ে দেওয়া তাঁরই।"

মহিষের গাড়িতে দু'খানা কম্বল পেতে বড়মিঞা তাঁর চাকরকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে, আবার আদাব দিয়ে বড়মিঞা জানিয়ে দিলেন— "কাকাঠাকুর, আপনার এই মোছলমান ভাতিজা কিন্তু মাঝে মাঝে দফরপুরে গিয়েও আপনাকে বিরক্ত করবে। দফরপুরের পাশের গ্রাম সুজাপুরে আমাদের আত্মীয় আছে।"

পণ্ডিত মশায় তাঁর মোছলমান ভাতিজাকে প্রতি আদাব জানিয়ে বিদায় নিলেন আর বললেন—"বাপজান, তোমাকে দোয়া করছি —যেন তোমার এই দিল চিরদিন থাকে।"

করযা হতে দফরপুর ১৭ মাইল পথ। বড়মিঞার জোরালো মহিষ বেলা থাকতে থাকতেই পণ্ডিত মশায়দের দফরপুরে পৌঁছে দিলে।

পণ্ডিত মশায়ের বড় ভায়রাভাই কেশবচন্দ্র অধিকারী মহাশয় রাসবিহারী নামে এক পুত্র রেখে মারা গিয়েছেন। রাসবিহারীর বয়স এখন ১২/১৩ বৎসর। পণ্ডিত মশায়ের পুত্র হেমের চেয়ে সে ৬/৭ বৎসরের বড়। রাসবিহারীই এখন বাড়ির মালিক। বাড়িতে সে ছাড়া আছে তার মা—মুক্তকেশী, খুড়িমা-মাসিমা-সহচরী, মাতামহী রাজবালা। রাজবালা পণ্ডিত মশায়েরও শাশুড়ী। বড় কন্যার আশ্রয়ে গঙ্গাতীরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য বাস করছেন।

এই বাড়ির বাইরে গাড়ি থামিয়ে, গাড়োয়ানটি পণ্ডিত মশায়ের হাতে একখানা চিঠি দিলে, চিঠিখানি পাঠ করে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

চিঠি

কোটি কোটি আদাব অন্তে নিবেদন—

কাকাঠাকুর, বেয়াদবী মাপ করবেন। কাকীমা আর আপনি বড় বিপদে রিক্তহস্তে কুটুম বাড়ি যাইতেছেন। কুটুম্বর বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকা সম্ভব। কিছু হাতে করিয়া না গেলে, তাহা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়। গাড়ির পশ্চাৎভাগে সামান্য চিড়ে আর এক কলসী গুড় দিলাম। এই সামান্য জিনিস আপনার দোওয়ার ভাতিজার নিজের জোতে উৎপন্ন। আপনাকে জানাইয়া সামনাসামনি দিলে হয়ত আপনি আপত্তি করিবেন, এই আশঙ্কায় আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার হুকুম না লইয়াই, গাড়ির পিছনে বাঁধিয়া দিয়া যে গোস্তাপি করিয়াছি, তাহা অবোধ ভাতিজা বলিয়া মাফ করিতে আজ্ঞা হয়।

দীন সাদেখ

আপনার স্নেহের বাপজান।

পরদিন অতি প্রত্যূষে করযার মিঞা সাহেবের গাড়োয়ান বাড়ি ফিরবার জন্য পণ্ডিত মশায়ের অনুমতি নিতে গেলে, পণ্ডিত মশায় তার মারফতে দু'কথায় তাঁর (মিঞার) পূর্বদিনের পত্রের জবাব দিলেন—

জবাব চিঠি

দোওয়াবরেষু

বাপজান, খোদাতাল্লা সদয় হইয়া তোমাকে যে দিল দিয়াছেন, তাহা সঈদ বংশীয় মুসলমানেরই যোগ্য। আমি দয়াময় খোদাতাল্লার নিকট তোমার এই নিয়ৎ ও তবিয়ৎ অটুট রাখার জন্য আরজ করিতেছি।

তোমার
"কাকাঠাকুর"

॥ বঞ্চনঞ্চাপ মানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

দফরপুরের স্ত্রী-র বড় বোনের বাড়িতে ঈশানচন্দ্র এসে আশ্রয় নিলেন। কেন এখানে এলেন, কতদিন থাকবেন, কিছুই কারো কাছে বললেন না। কাকে বলবেন ? বাড়ির মালিক পিতৃহীন রাসবিহারী —তার বয়স মাত্র ১২ কি ১৩ বৎসর। তার মা মুক্তকেশী—যদিও তার স্বামী ৺কেশবচন্দ্র অধিকারী মহাশয় বাড়ি, বাগান, ধানের জমি, বহু শিষ্য সেবক প্রভৃতি আয়ের পন্থা রেখে গেছেন, কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকায়, তিনি মেয়ে মানুষ—কেমন করে এই নাবালক ছেলে রাসবিহারীকে মানুষ করবেন, কেমন করে বংশের গৌরব বিগ্রহ দেবতা—রাধাবিনোদ, বিজয়বিনোদ, মহাপ্রভু প্রভৃতি ঠাকুরের নিত্য-সেবা চালাবেন, কেই বা জমিজমা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধান

করে, এই সব ভাবনাতেই অস্থির। রাসবিহারীর ১২ বৎসর বয়স হলেও সে 'ক' অক্ষর পর্যন্ত চেনে না। গ্রামে ব্রাহ্মণ মোট ২ ঘর। হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১৫০ ঘর পুণ্ডুরী। এরা এখন পুণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করেছে। এদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় কৃষিকার্য আর রেশমকীট (গুটীপোকা) পালন করে রেশম উৎপন্ন করা। এদের মধ্যে এক ঘর গৃহস্থ খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। রেশমের ব্যবসা করেই অবস্থার উন্নতি করেছিলেন। কলকাতা ঝামাপুকুরের স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্রের পূর্বপুরুষ এবং তিনি নিজেও এঁদের সঙ্গে অংশে রেশম ব্যবসায় চালাতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির অধিবাসী ৺উৎসব মণ্ডল ও তাঁর ছোট ভাই ৺গদাধর মণ্ডল পান্‌সি বোঝাই করে কলকাতায় রেশম চালান দিতেন। তখন রেল লাইন হয়নি।

রাসবিহারী এই সব পুণ্ডুরী বালকদের সঙ্গে খেলা করে গান গেয়ে, ডুগিতবলা বাজিয়ে সময় কাটাতো। মুক্তকেশী পিতৃহীন ছেলেকে অত্যধিক স্নেহদৌর্বল্যের জন্য কিছু বল্‌তে পারতেন না। ক্ষুদিরাম সরকার নামে একজন বিদেশী কায়স্থ মণ্ডলদের বাড়িতে পাঠশালা খুলেছিলেন। রাসবিহারী একদিন তাঁর হাতের প্রহার খেয়ে, মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে, মায়ের কাছে এসে পিঠে সরকার মশায়ের ছড়ির দাগ দেখালো। ছেলের পিঠে প্রহারের দাগ দেখে মুক্তকেশী সরকার মশায়ের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গালাগালি দিয়ে ছেলের পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন —শিষ্যসেবক আছে, তাদের কানে মন্তর দিয়ে, মাথায় চরণ ঠেকিয়ে বাছা আমার রোজগার করবে। ভাবনা কি? নির্বংশের বেটা সরকারের হাতে মার খেয়ে বাছা আমার মরে গেলে কি লেখাপড়া নিয়ে স্বগ্‌গে যাবো। রাসবিহারী মায়ের অনুমোদন পেয়ে আর পাঠশালা-মুখো হয়নি।

ধরমপুর হতে সদ্য আগত তার মাসতুতো ভাই—তখন তালপাতা

লেখা শেষ করেছে। রাসবিহারীর মেসো ঈশান পণ্ডিত মশায় রাসবিহারীর 'বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ' শুনে তার মাটিতে ক খ লেখা আরম্ভ করিয়ে দিলেন। ভগ্নীপতি এখানে এসেই রাসবিহারীর লেখাপড়া শুরু করে দেওয়ায় মুক্তকেশী ভারী খুশী হলেন।

একদিন ঈশানচন্দ্রকে নির্জনে ডেকে মুক্তকেশী বললেন—"ভাই, ইচ্ছার মুখে শুনলাম—তোমার ভাইপোরা নাকি তোমাদের পৃথক করে দিয়েছে। তাই যদি হয়, আর তুমি যদি কিছু মনে না করো, তবে আর ধর্মপুরে গিয়ে কাজ নেই। তোমার দাদার (মুক্তকেশীর স্বামী) মৃত্যুর পর আমাকে ঠাকুর সেবার জন্য মাইনে দিয়ে পূজারী রাখতে হয়েছে। তুমি এসেই রাসবিহারীকে লেখাতে আরম্ভ করেছো। ভাই, যদি দয়া করে এখানে থেকে যাও !···[অসমাপ্ত]

POST BOX 11404
Calcutta-6

দীর্ঘায়ু নিরাপৎস্থ,

গত রাত্রে শ্রীমান মানকু ভাই হাওড়ার বাসায় প্রায় রাত ১০টা পর্যন্ত বসে কাটিয়েছে।......লোকে গ্রামে এখনও বলে, দাদাঠাকুরের টাকা নাই, ছিলেন কাকা তাতেই তাঁর সব অভাব চলে গেছে।...বিলাত হতে একটা ছেলে লিখেছে ৺রসিকলাল পণ্ডিতকে বাদ দিলে দাদাঠাকুরের সত্তা থাকে না।...সত্যি বাবা।...বাবা, যতই পরীক্ষা হোক ভয় করলে চলবে না। আজীবন পরীক্ষা দিতে হবে। মন খারাপ করা চলবে না। মন ঠিক খাঁটী ৪০ সের। অত ভারী জিনিস যদি ।০ আনা ။০ আনায় টলে তার মন নাই ছটাক। মন কেবল ভয় করে 'শমন'কে অর্থাৎ ১০০ মণ অর্থাৎ যমকে। তাও যম পারে না। যার 'সংযম' আছে। যম চেয়ে সংযম ২ অক্ষর বেশি।

শুভকাম—
শ্রীশরৎ

শ্রীলবকুমার বসু
সোয়াঙ কোলিয়ারী
হাজারীবাগ।



চিত্র পরিচিতি ঃ বামদিক থেকে ঃ—

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, দাদাঠাকুর, প্রণতি ঘোষ, অমল মিত্র, শিশিরকুমার, চিত্রা রায়, লবকুমার, বাসন্তী বাগচী এবং সুকোমলকান্তি ঘোষ।

১৯৫০ সালের ২রা অক্টোবর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির জন্মোৎসবে গৃহীত আলোকচিত্রটি শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



উপবিষ্ট ঃ বামদিক থেকে ঃ—

(১) হরিকুমার চক্রবর্তী (হ্যারী), (২) এলেন রায়, (৩) দাদাঠাকুর, (৪) অমল মিত্র, (৫) মানবেন্দ্রনাথ রায়, (৬) সুহাসচন্দ্র রায়।

দণ্ডায়মান ঃ বামদিক থেকে ঃ—

(১) শুভ্রকান্তি মিত্র, (২) প্রমোদ মিত্র, (৩) নির্মলরঞ্জন মিত্র, (৪) পদ্মাবতী মিত্র, (৫) চিত্রা রায়, (৬) নীলিমা মিত্র, (৭) ঊর্মিলা বসু, (৮) প্রফুল্ল ঘোষ।

[ফটো ঃ প্রশান্তকুমার গুপ্ত]

ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—প্রতাপচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। এঁদের জন্ম দফরপুরে। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হয় দফরপুরে, ১২৬৬ সালে। হরিলাল, রসিকলাল ও কন্যা কৈলাসকামিনীরও জন্ম ওখানে। তখন কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে বাসা করে থাকতেন ঈশানচন্দ্র। তিনি বারো টাকা খাজনায় বারো বিঘা জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন নাটোররাজের ছোট তরফের জমিদারিতে। জঙ্গিপুরের জমিদার বিজয়গোবিন্দ বড়াল দফরপুর গ্রামে বাস করার জন্য তাঁকে জমি দান করেন বিনা খাজনায়। সেই ভাঙা ভিটা আজও আছে। কোন লেখাপড়া দলিলপত্র ছিল না। প্রায় সত্তর বছর পরে বিজয়গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সেটেল্‌মেণ্টে কর ধার্য করার জন্য মোকদ্দমা করেন। তখন দাদাঠাকুরের বয়স অনুমান ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। দাদাঠাকুর আদালতে হাকিমকে বলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে চান, কোন ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকের দান তিনি গ্রহণ করতে চান না। এই কথায় বিজয়গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, মোকদ্দমা তুলে নিলেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা হরিলাল ১২৯০ সালে চব্বিশ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিকলাল তখন ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ঐ গ্রামের ইস্কুলে পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেছিলেন। বেতন সম্ভবত দশ টাকা। তিনি ইংরাজী জানতেন যৎসামান্য। ১২৮৮ সালের ১৩ই বৈশাখ বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অন্তর্গত সিমলান্দি গ্রামে মাতামহের গৃহে দাদাঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতামহ ঈশানচন্দ্র রায়, মাতামহী নুটুকামিনী দেবী। ১২৯০ সালে হরিলালের মৃত্যুর চার বছর পরে ১২৯৫ সালে দাদাঠাকুরের মাতা

তারাসুন্দরী দেবী স্বর্গারোহণ করেন। হরিলালের মৃত্যুর সময় রসিকলালের মাত্র উনিশ বছর বয়স। মৃত্যুর সময় হরিলাল রসিকলালকে বলেছিলেন—'শরৎকে দেখো'।

অনুরোধের উত্তরে রসিকলাল যা বলেছিলেন এবং দাদাঠাকুরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা দাদাঠাকুর কোন এক সময়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

"কাকা আমার বাবাকে বলেছিলেন, 'দাদা! বাবা চলে গেছেন, মা চলে গেছেন, তুমিও যাচ্ছ—দাদা! স্থানটা থাকবার নয়—কেউ থাকে না! তোমার খোকা আর তার মায়ের জন্যে তোমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে বলছি। এদের ভাবনা তোমার মনে যাতে না থাকে, সেই চেষ্টা করাটাই আমার কর্তব্য মনে করছি। শুনেছি, স্ত্রী-পুত্রাদির আকর্ষণ মনের মধ্যে থাকলে নাকি পুনর্জন্ম হয়—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তোমার স্ত্রী-পুত্র খাবার পরবার কষ্ট পাবে না, এ ভরসা আমি তোমাকে দিচ্ছি। আমাদের বিশ-পঁচিশ বিঘা জমি আছে। তোমার মহাযাত্রার সময় তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—বিয়ে আমি করবো না, তোমার খোকার জমি-জমার অংশীদার কেউ হবে না।'

"আমার যখন সাত বছর বয়েস মাতৃদেবী সংসারের মায়া কাটিয়ে কাম্যধামে গমন করে বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেলেন।

"বাবার মৃত্যুর পরে মা যতদিন জীবিত ছিলেন, বাড়ির গাই দুয়ে সেই দুধে পরমান্ন তৈরি কোরে নতুন কাপড় পরিয়ে স্বহস্তে খাইয়ে দিতেন আমার জন্মদিনে। মা যখন তুলসী তলায় আমার জন্য কল্যাণ কামনা করতেন, কাকা তখন আমাকে মায়ের দুটি চরণে মাথা ঠেকিয়ে মন্ত্র বলতেন :

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ-পোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সমোগুরুঃ॥

"মায়ের পরলোক গমনের পর কাকা তুলসী তলায় আমাকে নতুন কাপড় পরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা তো নেই, এবার কি করবি

বলতো?' আমি উত্তর দিয়েছিলাম—'আপনি যা বলবেন তাই করবো।' আমি কাকাকে 'কাকা' বলতাম না, 'বাবা' বলে ডাকতাম। উনি বলে উঠলেন—'তোকে দিন চার আগে যে শ্লোকটা শিখিয়েছিলাম সেটা কি এর মধ্যে ভুলে গেলি?'

"আমি জিভ কেটে বলে উঠলাম—ভুল করেছি বাবা! আরও ছ'টি মা আছেন যে! সব মানুষেরই তো সাতটি মা :

'(১) আদি মাতা, (২) গুরু পত্নী, (৩) ব্রাহ্মণী, (৪) রাজপত্নিকা, (৫) গাভী, (৬) ধাত্রী, (৭) তথা পৃথ্বী সপ্তেতে মাতরঃ স্মৃতা।'

"আমি শ্লোকটী বলার পর কাকা বললেন—'এই যে সাতটি মা আছেন, এর মধ্যে সবচেয়ে কে তোর বেশি উপকার করেছেন বলতে পারিস?' বাবা এর আগের দিন বলেছিলেন—'শ্লোকটার ছন্দ রাখার জন্য মায়েদের কার্যকারিতা বিচার না করে বলা হয়েছে। আদি মাতা অর্থাৎ গর্ভধারিণী অপেক্ষা কার্যকারিতায় ধাত্রী-মা অর্থাৎ ধাই-মা তোমার জীবন রক্ষার জন্য যা করেছেন তা অন্য কেউ করতে পারেনি। মা তোমার যখন প্রসববেদনায় মৃতবৎ অচেতন তখন ধাত্রী-মা না থাকলে জীবন রক্ষা হোতো না'।"

"কাকা ধাই-মার (তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, থাকতেন আমার মামার বাড়ির গ্রামে।) জন্যে একখানা দশ-গজা কাপড় কিনে এনে তার এক কোণে একটি টাকা বেঁধে বাক্সে রাখতেন। দফরপুর গ্রামের পাশ দিয়ে মা ভাগীরথী প্রবাহিত হয়েছেন। দশহরার দিনে কিংবা সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলেই ধাই-মা দুই নাতিকে (দৌহিত্র) সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাবা ধাই-মাকে সেই কোণে-টাকা-বাঁধা কাপড়খানা দিতেন। যাবার সময় দুই নাতিতে দুটি পাকা কাঁঠাল ঘাড়ে করে নিয়ে যেতো। ধাই-মা একবার বাবাকে বললেন—'আমাকে আর পুরো গজের কাপড় দেবেন না; ন-গজা কাপড় না হলে সামাল দিতে পারি না।' বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন —'ধাই-মাকে কাপড় দিয়ে মনে মনে প্রণাম করিস্। দেখিয়ে প্রণাম

করলে সে প্রণাম নিতে পারবে না। ওরা জাতে মুচি, ব্রাহ্মণের প্রণাম নিলে পাপ হবে মনে করে।' ধাই-মা আমার বাবাকে বলতেন— 'বাবা, আমার হাড় ক'খানা যাতে গঙ্গার জলে পড়ে তাই ব্যবস্থা করবেন।' "ধাইমার কথা শুনে বাবা দশটা টাকা আলাদা করে বাক্সে রেখেছিলেন। পরে সেই টাকা ধাইমার সৎকাজে লাগানো হয়েছিল।

"আমার বাবা আমাকে বলে রেখেছিলেন, 'যখন ধাই-মা গঙ্গালাভ করবে, তুই তিনদিনে একটা ভোজ্য উৎসর্গ করিস্।' সে ব্যবস্থা আমি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের পণ্ডিত স্বর্গত ন্যাংটেশ্বর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ মতো স্নানের ঘাটে করেছিলাম। আমার খুব একটা ভুল হয়েছিল, আমি ধাই-মাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর রাখা নাম 'গোলাপ বউ' বলে জানতাম। গোত্র 'যথা নাম' বলে, আমার জানা নাম 'গোলাপ ধাইমা' বলে মন্ত্র বলেছিলাম। পরে জেনেছিলাম ওঁর আসল নাম 'মানদা'। পণ্ডিতমহাশয় আমার দ্বারা ভোজ্য উৎসর্গ করা কোন অবিধি বা অশাস্ত্রীয় হয়েছে বলে দোষ ধরেন নি।"

দাদাঠাকুর ধাই-মাকে কোনোদিন ভোলেননি। কারণ ধাই-মা তাঁর মাতৃদেবীকে আন্তরিক সেবা যত্ন করেছিলেন। বহুদিন সেই ধাই-মা মানদা জীবিত ছিলেন। দাদাঠাকুর তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন এবং প্রতি বৎসর কাপড় এবং সাধ্যমতো অর্থ দিতেন।

এখানে তাঁর কৃতজ্ঞতার, এবং তেজস্বীতারও বটে, আর একটি নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতের হেড পণ্ডিত ন্যাংটেশ্বর চূড়ামণি মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তখনকার সেক্রেটারি তাঁর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন মাসিক দশ টাকা হিসাবে। কয়েক বছর পরে নতুন পরিচালকমণ্ডলী সেই বৃত্তি বন্ধ করে দিলে চূড়ামণিমহাশয় অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লেন।

পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন চূড়ামণিমহাশয়ের

প্রাক্তন ছাত্র। বৃত্তি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্যে তিনি পরিচালকদের বিনীত প্রার্থনা-পত্র দিতে প্রস্তুত জানতে পেরে দাদাঠাকুর তা থেকে চূড়ামণিমহাশয়কে নিবৃত্ত করেন এবং প্রতি মাসে তাঁকে দশটি টাকা কোরে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। চূড়ামণিমহাশয় পরিচালকমণ্ডলীর কাছে নিজেকে খাটো করবেন—এটা দাদাঠাকুরের সহ্য হোলো না। ছাপাখানার খরচ চালিয়ে অতিকষ্টে সংসার চালাতেন তখন তিনি। চূড়ামণি মহাশয় দাদাঠাকুরের অঙ্গীকারে একটু কিন্তু বোধ করছেন দেখে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার কোনোই অসুবিধা হবে না।'

চূড়ামণি মহাশয় যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন দাদাঠাকুর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র রসিকলালের বিষয়ে বলেছিলেন :

"বাবা খুব রাগী ছিলেন। তাঁর অভিধানে ক্ষমা বলে কোন শব্দ পাওয়া যেত না।" নিজের বাঁ পায়ের হাঁটুতে কাটার দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন—"আমার প্রথম কবিতার এই নোবেল প্রাইজ।—বছর এগারো বয়সে গ্রামে খুব কলেরা দেখা দিল। নব্‌বুইজন লোক মারা গেল। কলেরার সময় গ্রামে নগরসংকীর্তন বেরুলো। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী হরিপ্রসাদ চাটুজ্যেমশাই অগ্রণী হয়ে সংকীর্তন করছেন। সেদিনকার গান ছিল :

'শমন-দমন যাতে হবে রে ভাই হরি বল
(দুই বাহু তুলে)
রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নাই রে, ভাই হরি বল।

"আমি খুব লক্ষ্মী ছেলে। গানটিকে ভেঙচিয়ে মুখে মুখে তার অনুকৃতি করলাম :

'হুটো বমি একটা দাস্ত
করতে পারবে না বরদাস্ত,
দেখিতে দেখিতে নাড়ী নাই রে !
ভাই হরি বল।'

"চাটুজ্যেমশাই হরিনামের ব্যঙ্গোক্তি শুনে শাসিয়ে বললেন—'থাম, তোর কাকাকে বলে মজা দেখাচ্ছি !' তখনি ওখান থেকে ছুটে বাড়ি এসে পড়তে বসে গেলাম, যেন কিছু জানিনে। ঘুরতে ঘুরতে যখন হরিনামের দল আমাদের পাড়ায় এলো তখন বাবা বৈঠকখানার কাছে কাঁঠালতলায় টুলের ওপর বসেছিলেন। হরিনামের দল রাস্তা দিয়ে চলে গেল। চাটুজ্যেমশাই বাবাকে মামা বলে ডাকতেন। এসে বললেন—'মামা, আপনার ভাইপোর কাণ্ড জানেন? গ্রামের কত লোক মারা গেল, আমরা গ্রামের কল্যাণের জন্যে হরিসংকীর্তন করছি আর ছোঁড়াটা ভেঙচিয়ে তোমার বমি হবে, নাড়ী ছেড়ে যাবে—এই বলে গান গাইতে লাগল !' যেই আমার বিরুদ্ধে নালিশ হওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে মামলার ডাক। এসব মামলা এক তরফাই হোতো, আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অবকাশ তিনি দিতেন না, কারণ ভাইপোটি কেমন লক্ষ্মীছেলে তা তাঁর অগোচর ছিল না। আমায় ডেকে চাটুজ্যেমশাইকে বললেন, 'একটু দাঁড়াও, অপরাধের দণ্ড দেখে যাও।' এইধরনের মামলায় ডাক হলেই আমি চেয়ে দেখতাম বাবার পায়ে জুতো না খড়ম আছে, কারণ জুতোর দণ্ডটা খড়মের দণ্ড অপেক্ষা লঘু বলেই মনে করতাম। সেদিন তাঁর পায়ে ছিল খড়ম। কাজেই আমাকে কোন প্রশ্ন না করেই বাদীর সামনেই খড়মের চরম দণ্ড আরম্ভ হোলো। ফলে সমস্ত দেহে রক্তারক্তি। চাটুজ্যেমশাই আমার শাস্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে হরিনামের দলে যোগ দিয়ে চলে গেলেন। এই ছিল একদিনের ঘটনা। দণ্ডের পর রাত্রে আরম্ভ হোলো আবার চিকিৎসা। যে যে জায়গায় কেটে গিয়েছিল সেখানে গোয়াল থেকে গোবর আর চোনা মিশ্রিত মলম এনে লাগানো হোলো। বাবার

কাছেই রাত্তিরে শুয়ে থাকলাম এক বিছানাতেই। শুয়েই আদর করে গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। যে যে জায়গায় কেটে গিয়েছিল, হাত দিলেই সেখানে ব্যথা লাগায় বললাম, 'হাত দেবেন না, ওখানে কেটে গেছে।' বললেন—'তুই বজ্জাতি করিস্ আর তাই তো লোকের কথা শুনে তোকে মারি। দেখ তো কত মেরেছি, আর অমন করিসনে।' এমনিতর বাবা ছিলেন বাইরে যতো কঠোর, ভেতরে তত কোমল। তবে এও ঠিক যে, এই শাসন থেকেই যখন এমন সোনার-চাঁদ হয়েছিলাম, একটু আলগা পেলে না জানি কি হতাম! তারপর রাত্তিরের অঙ্গসেবার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল হরি চাটুজ্যের উপরে। পরের দিন সকাল বেলায় আমাদের বাড়ির নিচে ডোবার পাড়ে চাটুজ্যেমশাইকে দেখেই আবার আমার সংকীর্তনস্পৃহা জেগে উঠল। কাল যেটুকু কীর্তনের ভেঙচানিতে বলেছিলাম তারপরেই আবার নতুন পদাবলী যোগ করলাম। হরি চাটুজ্যের দাদার নাম সারদা চাটুজ্যে। কালকের গানে নাড়ী ছাড়া পর্যন্ত ছিল, আজ আরম্ভ করলাম—

'তোমার ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় কররে গলা
সার করবে তুলসীতলা।
সারদা কাঁদবে কোথায় গেলে
ভাইরে ভাই, হরি বল।'

আমার পদাবলী শুনে হরি চাটুজ্যে কাঁঠাল তলায় যেখানে বাবা কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন, সেইখানে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। দেখে বললাম—'এখনি যাচ্ছ কি, আরও শোনো।' আমাদের গ্রামে 'বাহিরঘাট' বলে একটি ঘাট আছে, তার পাশেই শ্মশান। গান ধরলাম—

'তোমায় শোয়াবে ভাই দড়ির খাটে,
নিয়ে যাবে বাহির ঘাটে,
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে করবে ছাই রে—
ভাই রে ভাই, হরি বল।'

রচনা করছি সব মুখে মুখে। তুষ্ট ছিলাম খুবই।

"আগের দিন কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলিনি। গ্রামের কলেরা উপলক্ষ্য করে বলেছিলাম যে, হরিনামে দাস্ত বমি বন্ধ হবে না। চিরকালই তাই ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমার পদাবলীর প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে চাটুজ্যে মশাই বাবা যেখানে খেলছিলেন সেখানে গিয়ে চিৎকার করে বললেন—'কী পাজী ছেলে, কাল অমন মার মারলেন, আজ আবার ডোবার ওপার থেকে সুর করে গাইছে—তুমি মরবে, তোমার দাদা কাঁদবে, বাহিরঘাটে তোমাকে নিয়ে গিয়ে পোড়াবে।—কী পাজী ছেলে, এমন ছেলে ভূ-ভারতে দেখিনি!'

"বাড়ি গিয়ে ঝিয়ের কাছে মুড়ি চাইলাম, মতলব—মুড়ি খাবো আর বলবো—আমি বাড়ি থেকে কোথাও যাইনি, বসে বসে মুড়ি খাচ্ছি। মনে মনে সাফাই ঠিক করছি, এমন সময় মামলার ডাক পড়ল। হাজির হয়েই দেখলাম—রাত্তিরে মারার পর বাবা যে একটু সোহাগ করেছিলেন তা সব ধুয়েমুছে গেছে। বাবা তখন দাবা খেলছিলেন। চাটুজ্যে মশাইকে ভরসা দিলেন—'হরি তুমি যাও, এসব ভদ্রলোক আছেন, এঁদের সামনে আবার আজ ওকে প্রহার দেবো।'

"আমায় বসতে বললেন। দাবা খেলা চলতে লাগল। খেলা শেষ হতেই আমার হাত দুখানি জোরে ধরে বাবা বললেন—'আজ আবার কি বলেছিস?' একেবারে সাফ জবাব দিলাম 'আমার সঙ্গে ওঁর দেখাই হয়নি, কাল মার খাইয়ে আবার আজ মার খাওয়াতে এসেছেন!' বাবা বললেন, 'তুমি কিছু বলোনি? আমার পায়ে হাত দিয়ে বলো।' বাবার পায়ে হাত দিয়ে মিছে কথা বললে কিছু একটা মন্দ হবে এ ধর্ম-জ্ঞান আমার হয়েছিল। বললাম—'কালকের গানটা ছোট হয়েছিল সেইটাকে কিছু বড় করে গাইছিলাম। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই নেই'।"

গঙ্গাস্নানে যেতেন রসিকলাল, সঙ্গে নিতেন স্নেহের শরৎকে। স্নান করে ফেরবার সময় পথের ধুলো-বালি অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, খালি পায়ে দাদাঠাকুরের খুবই কষ্ট হোতো, লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরতেন। একদিন স্নান সেরে ফেরবার পথে দাদাঠাকুর বললেন—'বাবা, জুতো না হলে চলতে বড় কষ্ট হয়।'

রসিকলাল বললেন—'হ্যাঁ, বালির তাত সূর্যের চেয়েও বেশি গরম। তুমি আজ হরি স্যাকরাকে বলে এস বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

দাদাঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বলে এলেন। সেই স্যাকরার একটি পা খোঁড়া ছিল, বগলে ক্রাচ লাগিয়ে বিকালে রসিকলালের কাছে এসে উপস্থিত। দাদাঠাকুরের মনে সেদিন আনন্দের সীমা নেই, কারণ এবার সোনার জুতো হবে। প্রায় দেড় মাইল পথ হেঁটে ক্রাচ বগলে লাগিয়ে স্যাকরা এসেছে।

দাদাঠাকুরের ডাক পড়ল। নিকটেই উল্লসিত মনে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। দাদাঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেই রসিকলাল বললেন—'শরৎ, ও এসেছে এতটা পথ, ওর একটা পা নেই, কাঠের পায়ে হাঁটে। তোমার দুটো পা আছে, তাতেও তোমার কষ্ট হয়?'

দাদাঠাকুর সলজ্জভাবে বললেন—'বাবা, আমার জুতো চাই না।'

এই রকম নানানভাবে এবং নানান কাজের মাধ্যমে রসিকলাল স্নেহের শরৎকে সৎ-শিক্ষা দিতেন।

মিষ্টি কিনে এনেছেন রসিকলাল। ঘরের চালার সঙ্গে দড়ি দিয়ে শিকে ঝুলিয়ে তাতে মিষ্টির হাঁড়ি রেখেছেন। মিষ্টি নিতে গিয়ে নজর করলেন মিষ্টি গুনতিতে কমেছে। ডাক পড়ল দাদাঠাকুরের, প্রশ্ন করলেন—'তুমি মিষ্টি খেয়েছো?'

তৎক্ষণাৎ মিথ্যা জবাব দিলেন দাদাঠাকুর—'না বাবা, আমি মিষ্টি খাইনি।'

রসিকলাল—'বাড়িতে..তুমি আর আমি আছি, আমি খাইনি, তুমিও বলছো খাওনি, কি করে কমেছে সত্যি কথা বলো?'

দাদাঠাকুর তখন ভয়ে ভয়ে স্বীকার করলেন মিষ্টি তিনি খেয়েছেন।

রসিকলাল ধীরভাবে বললেন, 'প্রথম অন্যায়—চুরি করে খেয়েছো, দ্বিতীয় অন্যায়—মিথ্যে কথা বলেছো। জিভকে সংযত করতে পারোনি, দুটি অন্যায় জিভকে দিয়ে করিয়েছো। এখন থেকে তুমি একমাস মিষ্টি খেতে পাবে না।'

নিজে মিষ্টি খেতেন রসিকলাল, শরৎকে দিতেন না।

এক সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ খেতে গেলেন, সঙ্গে নিলেন শরৎকে। পাতা করে যখন নিমন্ত্রিতদের খেতে ডেকেছেন গৃহকর্তা, দাদাঠাকুর দৌড়ে গিয়ে রসিকলালের কাছ থেকে কিছু দূরে একটি আসনে গিয়ে বসেছেন। রসিকলালের নজর ঠিক পড়েছে। ডাক দিলেন—'শরৎ, আমার পাশে এসে বসো।'

নিরুপায় দাদাঠাকুর পাশেই বসলেন এসে। দূরে আড়ালে বসে মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা বিফল হোলো তাঁর। মিষ্টি পরিবেশন করতে এলে রসিকলাল মিষ্টি নিলেন কিন্তু শরৎকে মিষ্টি দিতে বারণ করে দিলেন সকলের সামনেই।

সকলেই নীরব হয়ে দেখলেন।

একটি ভদ্রলোক রসিকলালকে মৃদুভাবে প্রশ্ন করলেন, 'শরৎকে মিষ্টি দিতে বারণ করলেন কেন?'

রসিকলাল উত্তরে বললেন—'কারুর চাকুরি করি না, কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।'

স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন রসিকলাল। কখনও কারুর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতেন না তিনি, বশ্যতাও স্বীকার করতেন না। তিনি

সকলের সামনেই বললেন—'শরৎ, কেন মিষ্টি খেতে দিলাম না, তুমি নিজে মুখে বলো।'

লজ্জিত দাদাঠাকুর। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'না বলে আমি মিষ্টি খেয়েছিলাম, মিথ্যে কথা বলেছিলাম। জিভ দিয়ে আমি দুটি অন্যায় কাজ করেছি। এইজন্যে আমার শাস্তি—একমাস মিষ্টি খেতে পাবো না।'

এরপর কেউই আর একটি কথাও বলেননি সাহস কোরে।

আর একদিন মধ্যাহ্নে এক নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দাদাঠাকুর বেশি পরিমাণে ভাত খেয়েছেন, পরে যখন পরমান্ন (পায়েস) পরিবেশন করা হোলো, তখন দাদাঠাকুর পরমান্ন নিলেন না। রসিকলাল পরমান্ন না নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে দাদাঠাকুর বললেন—'বাবা, ভাত বেশি খেয়ে পেট ভরে গেছে।'

তখন চুপি চুপি রসিকলাল বললেন—'শরৎ, পথে বেরিয়ে একটা কথা বলবো।'

পথে বেরিয়ে রসিকলাল বললেন—'শরৎ, আজ যেমন অন্ন বেশি খেয়ে পরমান্ন খেতে পারলে না, তেমনি অর্থ অর্থ বেশি করলে পরমার্থ মেলে না।'

বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান দিতে শ্রদ্ধা করতে এবং গরীব, অসহায় দুঃস্থদের স্নেহ করতে, ভালোবাসতেও শিখিয়েছিলেন রসিকলাল দাদাঠাকুরকে।

ছেলেবেলা থেকেই দাদাঠাকুরের বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। অসাধারণ মেধাবীও ছিলেন তিনি।

ইস্কুলের পড়া শুনেই দাদাঠাকুর মুখস্থ করে ফেলতেন, সেটি নির্ভুল হোতো। কবিতা মুখে মুখে তৈরি করতে পারতেন। কবিতা ও ছড়ায় ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজী, বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের যাবতীয় বিষয় কমা সেমিকোলান ইত্যাদিও যথাযথ বসিয়ে নিজে কণ্ঠস্থ কোরে

অন্য সহপাঠীকে মুখস্থ করতে সাহায্য করতেন তিনি। যেদিন পড়া তৈরি না করে ইস্কুলে যেতেন সেদিন ক্লাশের পিছনের দিকে বসতেন।

শিক্ষকমহাশয়ের নজর ঠিকই পড়ত। প্রশ্ন করে জানতেন, শরৎ পড়া করে আসেনি। দাদাঠাকুর শিক্ষকমহাশয়কে অনুরোধ করতেন —তুজন ছাত্রকে পড়া বলতে বলার পর তাঁকে পড়া জিজ্ঞাসা করতে। তুজন ছাত্রের পড়া বলা শুনে নিজের পড়া বলতে পারতেন তিনি।

শিক্ষকমহাশয়রা সকলেই তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তাঁর তুষ্ট বুদ্ধির জন্য চমৎকৃত হতেন, আবার সময় সময় অসহ্যবোধও করতেন।

প্রাণনাথ মণ্ডল নামে তাঁর এক সহপাঠী ছিল। একদিন ক্লাশের মধ্যে চুপি চুপি প্রাণনাথকে দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—'তোর শাশুড়ী তোকে কি বলে ডাকবে?'

প্রাণনাথ কাঁদতে কাঁদতে ক্লাশের শিক্ষকমহাশয়কে বললে— 'স্যার, শরৎ কি বলছে!'

শিক্ষকমহাশয় জানলেন শরৎ কি বলেছে, এবং অবাক হলেন। তাঁর তুষ্টু বুদ্ধির শাস্তি দিলেন বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে।

ছুটির পর শিক্ষকমহাশয় দাদাঠাকুরকে নিয়ে গেলেন প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের কাছে। প্রধান শিক্ষকমহাশয় শরতের অসাধারণ মেধা ও অত্যন্ত তুষ্টু বুদ্ধির কথা জানতেন। বিস্মিত হয়ে সেদিন এ কথাও জানালেন—ও যদি ঠিক পথে চলে তাহলে ওর সমকক্ষ কেউ হতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আর একদিন বিদ্যালয়ের পরিদর্শক স্কুল দেখতে আসবেন। তাঁর সম্মানে স্কুলে ভোজের পর্যাপ্ত আয়োজন হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক-মহাশয় এবং অন্যান্য শিক্ষকরা তত্ত্বাবধান করছেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষক-মহাশয়রা পরিবেশন করছেন।

দাদাঠাকুর সব দেখেশুনে একজন সহপাঠীকে বললেন—'আজ স্কুলের শ্রাদ্ধ হচ্ছে।'

নিকটেই তৃতীয় শিক্ষকমহাশয় ছিলেন, কথা ক'টি তাঁর কানে গেছে। তিনি প্রশ্ন করলেন—'কি বললি শরৎ?'

দাদাঠাকুরের সোজা জবাব—'স্কুলের শ্রাদ্ধ হচ্ছে!'

তৃতীয় শিক্ষক—'জানিস আমাদের স্কুল সরকারী সাহায্য পায়, গভর্ণমেণ্ট এডেড (Government aided).'

দাদাঠাকুর—'জানি স্যার। A dead School.'

শিক্ষকমহাশয়—'বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে থাক।'

দাদাঠাকুর—'দাঁড়াচ্ছি স্যার, কিন্তু যদি স্কুল ইনস্‌পেকটর বেঞ্চের উপরে দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি সব কথা তাঁকে বলে দেবো।'

শিক্ষকমহাশয়—'আচ্ছা, এখন বোস্ পরে প্রধান শিক্ষক-মশায়ের কাছে তোর বিচার হবে।'

পরের দিন তৃতীয় শিক্ষকমহাশয় দাদাঠাকুরকে নিয়ে গেলেন প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের কাছে, সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানিয়ে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

প্রধান শিক্ষকমহাশয় সব কথা শুনে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়কে বললেন—'ওকে যদি শাস্তি দিই তাহলে ওকে discourage করা হবে। ভয়ে ও আর কোনদিন এমন কথা বলবে না। ও যেসব কথা বলে বা বলতে পারে আমরা তা পারি না। আমি ওকে শাস্তি দেবো একদিন পেট-ভরে মিষ্টি খাইয়ে।'

একদিন তাই হোলো। প্রধান শিক্ষকমহাশয় দাদাঠাকুরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে সন্দেশ খাইয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং বিশেষ আনন্দিত হলেন।

শিক্ষকমহাশয়দের ভবিষ্যদ্‌বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। দাদাঠাকুর স্বনামধন্য দেশবিখ্যাত পুরুষ হয়েছিলেন কালক্রমে।

এক সময় রসিকলালের বাড়ির আশেপাশে প্রায়ই চুরি হোতো। চোর ধরার এক বুদ্ধি দাদাঠাকুরের মাথায় এলো। তিনি ফণী-মনসার বড় বড় কাঁটাওয়ালা চ্যাপ্টা পাতা যোগাড় কোরে বাড়ির পেছন দিকের জমিতে ছড়িয়ে রাখলেন। মধ্যরাত্রে কান্নার শব্দে রসিকলালের ঘুম ভেঙে গেল, উঠে বললেন, 'শরৎ, করুণ কান্না কিসের?'

ধড়ফড়িয়ে দাদাঠাকুর উঠে বললেন, 'বাবা, চোর ধরা পড়েছে বোধহয়, আমি কল পেতেছিলাম।'

লণ্ঠন হাতে রসিকলাল শরৎকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখেন গ্রামেরই একটি দরিদ্র যুবক চুরি করতে এসে দুটি পায়ে কাঁটা-বেঁধা অবস্থায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। রসিকলাল যুবকটিকে তুলে নিয়ে এলেন ঘরে। পরে তার পা দুটি থেকে অনেক কাঁটা ছাড়ালেন, অনেক কাঁটা পায়ে বিঁধে রইল। রসিকলাল দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন—'শরৎ, এমনি কোরে কি চোর ধরে, কি করেছিস তুই! —একবার ভাল করে দেখ তো!'

শয্যাশায়ী হয়ে যুবকটি অনেকদিন কষ্ট ভোগ করেছিল। তার পা পেকে পুঁজ হয়ে অনেক কাঁটা পরে বার হয়েছিল। দরিদ্র ঐ যুবকটির পরিবারবর্গের জন্যে প্রতি মাসে নিয়মিত আধ মণ গম ও পাঁচটি করে টাকা রসিকলাল সাহায্য করতেন।

ছোটবেলায় একবার গান বা কোন কবিতা পাঠ করলে কিংবা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তা শিখে ফেলতেন দাদাঠাকুর। এমন কি গানের কথা ও সুর শিখে ফেলার দক্ষতাও তাঁর ছিল। একই সঙ্গে অনেকগুলি গান কথা ও সুরের সঙ্গে তুলে নিতে পারতেন তিনি নিখুঁত, নির্ভুলভাবে।

মাঝে মাঝে রসিকলাল রাত্রে যাত্রা শুনতে যেতেন শরৎকে বাড়িতে রেখে। বাড়িতে এক বৃদ্ধা ছিলেন, সম্পর্কে রসিকলালের

মাসিমা। তিনি রান্না করতেন এবং স্নেহ-যত্ন করতেন দাদাঠাকুরকে। তাঁর সব সময়েই আশঙ্কা ছিল দাদাঠাকুরের জন্য। কখন কি করে বসেন—এই ভয়। দাদাঠাকুর তাঁকে 'ঠাকুমা' বলে সম্বোধন করতেন। প্রায়ই রসিকলাল যাত্রা শুনতে যাবার পর চুপি চুপি ঠাকুমাকে বিশেষ অনুরোধ করে এবং যাত্রা ভাঙবার পূর্বেই নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ও অভয় দিয়ে যাত্রা শুনতে যেতেন দাদাঠাকুর। ঠাকুমা অনেক নিষেধ করে শেষ অবধি বালকের আবদার মেনে নিতেন। দাদাঠাকুর লুকিয়ে যাত্রা শুনতে গেলে, ঠাকুমা রাত্রে জেগে থাকতেন, শরৎ এলে দরজা খুলে দিতেন। রসিকলাল যাত্রা শুনে বাড়ি ফিরে আসার পূর্বেই দাদাঠাকুর বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুমার পাশে শুয়ে পড়তেন।

একদিনের ঘটনা—সকালে ঠাকুমা মুড়ি খেতে দিয়েছেন, একটি ছোট পাঁচিলের উপর কাঁথার দোলাই গায়ে জড়িয়ে পা ঝুলিয়ে মুড়ি খেতে খেতে পূর্ব-রাত্রের যাত্রার গান একের পর এক গাইতে শুরু করেছেন দাদাঠাকুর। ছেলেমানুষ, ভুলে গিয়েছেন যে, রসিকলালও যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন পূর্ব রাত্রে। যাত্রার সেই সকল গান রসিকলালের কানে পৌঁছাল। ডাক দিলেন—'শরৎ, এদিকে এসো। কাল রাত্রে কি যাত্রা শুনতে গিয়েছিলে ?'

মিথ্যা কথা বলার সাহস আর নেই তখন। কারণ রসিকলালের পায়ে খড়ম থাকলে দাদাঠাকুর বিশেষ সাবধান হতেন। হাতে-পায়ে কত কাটার দাগ দেখিয়ে বলতেন—'এই সব মিথ্যে কথা বলা আর ছড়া-কবিতা লেখার চিহ্ন।' তাই ভয়ে তখুনি বললেন—'হ্যাঁ বাবা, গিয়েছিলাম।'

রসিকলাল—'ক'টা গান শিখেছো ?'

দাদাঠাকুর—'সব ক'টাই।'

রসিকলাল কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলেন। তাঁদের সামনেই একের পর এক গান গেয়ে শোনাতে বললেন। কিছু কিছু গানের

ভাষায় ভুল হলো, তার কারণ গায়ক জুড়িদের উচ্চারণ অতি অস্পষ্ট, সব কথা ভালভাবে বুঝতে পারেন নি দাদাঠাকুর।

গান শুনে মুগ্ধ হলেন রসিকলাল, বন্ধুদের বললেন—'কি আশ্চর্য, এতগুলো গান একবার মাত্র শুনে শরৎ তুলে নিয়েছে।'

এদিকে দাদাঠাকুর কিন্তু শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রসিকলাল বাংলা ও সংস্কৃতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছাত্র পড়াতেন, হিন্দু-মুসলমান অনেক ছাত্র ছিল তাঁর। দাদাঠাকুরেরও বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল ছোটবেলা থেকেই। রসিকলালের একখানি সংস্কৃত শ্লোকের বই ছিল, সেই বইখানির মধ্যের কয়েকটি পৃষ্ঠা সুতো দিয়ে সেলাই করেছিলেন রসিকলাল, যাতে শরতের নজর সেই পৃষ্ঠাগুলিতে না পড়ে। সেলাই করা পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে অপূর্ব কতকগুলি শ্লোক ছিল যদিও অশ্লীল। এদিকে দাদাঠাকুরেরও বিশেষ কৌতূহল জানবার জন্য—ঐ সেলাই করা পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে!

একদিন কোনো কার্যোপলক্ষ্যে রসিকলাল গ্রামের কিছু দূরে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দাদাঠাকুর অনুমান করলেন রসিকলালের ফিরতে দেরি হবে। সুযোগ নষ্ট না করে অতি সাবধানে সেই সেলাই কেটে ফেলে সমস্ত শ্লোকগুলি অল্প সময়ের মধ্যে মুখস্থ করে আবার সাদা সুতোকে কিঞ্চিৎ মলিন করে বেমালুম সেলাই করে যথাস্থানে রেখে দিলেন। নতুন সেলাইয়ের সুতো একটু ময়লা করার জন্য আর ধরা পড়েননি তিনি। বৃদ্ধ বয়সেও সেই সব শ্লোক নির্ভুল মুখস্থ বলতেন দাদাঠাকুর।

প্রায় সকল কাজের মধ্য দিয়েই রসিকলাল স্বাবলম্বী হতে শেখাতেন দাদাঠাকুরকে। একবার একটি ফলের গাছ রোপণ করে রসিকলাল খুশি মনে জিজ্ঞাসা করলেন—'শরৎ, ফল হবে তো?'

সরল মনেই দাদাঠাকুর বলেছিলেন—'ভগবান যদি ফল দেন তো হবে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রসিকলাল একটি চাপড় মেরে বললেন— 'ভগবান দেবেন কেন ? তুমি দেবে জল, গাছের যত্ন করবে, ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন, হাত পা চোখ দিয়েছেন, আর ক্ষমতাও দিয়েছেন, যথেষ্ট রৌদ্র বাতাসও দিয়েছেন। তারপরেও তাঁকে বিরক্ত করা বা তাঁর কাছে কিছু চাওয়া কি ভালো ?'

এর কিছুকাল পরে রসিকলাল দাদাঠাকুরের বিবাহ দিলেন সুলক্ষণা পাত্রী শ্রীমতী প্রভাবতীর সঙ্গে। তখনও তিনি ছাত্র। বিবাহ উপলক্ষে মোট খরচ হয়েছিল মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা! দিদিঠাক্‌রুণের বয়স তখন মাত্র এগারো বছর। রসিকলাল নিজের কন্যার মতোই স্নেহ-যত্ন করতেন দিদিঠাক্‌রুণকে। ভাত-ডাল-তরকারী রান্না করতে শেখালেন। প্রতিদিন রসিকলাল আর দাদাঠাকুর এক সঙ্গে খেতে বসেন, দিদিঠাক্‌রুণ পরিবেশন করেন। একদিন ডাল মুখে দিয়েই দাদাঠাকুর বলেন 'এই রে, ডালে নুন দেয়নি, ভুলে গেছে !'

গম্ভীর হয়ে উঠলেন রসিকলাল। দিদিঠাক্‌রুণকে বললেন—'মা, কাল থেকে তোমার আর আমার রান্না একসঙ্গে হবে। শরতের চাল-ডাল-তেল-নুন সব আলাদা করে দেবে, ওর রান্না ও নিজে করে খাবে। খিচুড়ি, পোলাও যা ইচ্ছে করে খাবে।'

এদিকে আরো গম্ভীর স্বরে দাদাঠাকুরকে বললেন—'ছোট্ট মেয়েটা রান্না করে দিচ্ছে, তার ওপর এই রকম কথা !'

রসিকলাল পরের দিন একটি কুলোর ওপর অল্প চাল, ডাল, দুটি বড়ি, তেল নুন, কিছু কাঁচা আনাজ দাদাঠাকুরকে দিলেন, নিজের রান্না নিজে হাতে করে নেবার জন্য। রসিকলালের আর দিদিঠাক্‌রুণের রান্না আলাদা করা হল।

দাদাঠাকুর রান্না করে খেলেন না। নিকটেই একটি দেবালয় ছিল, লুকিয়ে এক ফাঁকে সেখানে গিয়ে প্রসাদ খেয়ে এলেন।

দু'দিন এইভাবে চললো, আবার সব পূর্বের মতোই ঠিক হয়ে গেল।

একদিন রসিকলাল দিদিঠাক্‌রুণকে বললেন—'মা, তুমি কিছু ভেবো না, আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমার ধান জমির অংশ তোমাকে দেবো।'

রসিকলালের সেই ব্যবস্থামতো দাদাঠাকুর চিরদিনই ধানের অর্ধেক ভাগ দিদিঠাক্‌রুণকে দিয়েছেন। নিজ মুখে বলতেন—'বৈষয়িক সম্পর্কে বাবা আমার খুড়তুতো ভগ্নী করে গেছেন তোদের দিদিঠাক্‌রুণকে!'

দিদিঠাক্‌রুণ লেখাপড়া জানতেন না। এক কুড়ি দু'কুড়ি করে গুনতে পারতেন।

দাদাঠাকুর বলতেন—'বাবার (কাকার) মৃত্যুর পর (১৩১১ সাল —ইং ১৯০৪) আমার Coronation (রাজ্যাভিষেক) হোলো।

কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে দাদাঠাকুরকে লড়াই করতে হয়েছে, সে সময় তাঁকে একমাত্র দিদিঠাক্‌রুণই সর্বদা সাহায্য করেছেন এবং আন্তরিক সহযোগিতাও করেছেন তাঁর সঙ্গে। কোনদিনও দুঃখ-কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নি দিদিঠাক্‌রুণ। পরনের শাড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে। দাদাঠাকুরকে কোন এক গৃহস্থ একটি থান ধুতি ও একখানি চাদর প্রণামী দিয়েছিল। সেই থান-ধুতিতে পুরোনো ছেঁড়া শাড়ীর লাল পাড় কেটে নিয়ে সেলাই করে দিদিঠাক্‌রুণ খুশীমনে পরেছেন। তাঁর দুটি হাতে শাঁখা-নোয়া ছাড়া আর অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। দাদাঠাকুর সোনার বালা দিয়ে দিদিঠাক্‌রুণকে প্রতারণা করেন নি। বলতেন—'সোনার বালার মধ্যে গালা থাকে। যদি সঙ্গতি হয় তাহলে সোনার বোর্‌খা করে ঢেকে দেবো ব্রাহ্মণীকে।'

দাদাঠাকুর ও দিদিঠাক্‌রুণের স্নেহ অপার। ছেলেরা দাদাঠাকুরের কাছে কোন বিষয়ে জানতে বা পরামর্শ করতে এলে দাদাঠাকুরের

পায়ের কাছে বসে দুটি পায়ে হাত দিয়ে পা টিপতে টিপতে কথাবার্তা বলতো। একদিন গল্পচ্ছলে শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্রকে দাদাঠাকুর বলেন—'মা, অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন দুপুরবেলা কাজ সেরে ছাপাখানা থেকে বাড়ি ফিরে দেখি ব্রাহ্মণী খুব চোখের জল ফেলছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমার এক পুত্র কিছু কড়া কথা বলেছে—এতে তাঁর মনে খুবই আঘাত লেগেছে। আমি সেই ছেলেটিকে ডেকে বললাম—'তুমি তোমার মাকে এমন কথা বলেছো যে, তাঁর চোখের জল পড়ছে। তুমি জানো এ বাড়ি আমার, এ বাড়িতে তোমার মায়ের সমান অধিকার আছে। মায়ের কাছে ক্ষমা চাও, যদি তোমার মা ক্ষমা করেন তাহলে ভাল, তা না-হলে এ বাড়িতে তোমার স্থান নেই'।

'ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার মায়ের পায়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, মুখ দিয়ে কথা ভালো করে বলতে পারলে না। ব্রাহ্মণীও ছেলেটিকে স্নেহভরা বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি ছেলেটিকে বললাম—'তুমি যাঁকে কটু কথা বলেছো, যাঁর মনে আঘাত দিয়েছো, তাঁর জন্যে তোমাকে যে শাস্তি দিচ্ছি সেই দেখে তিনি মনে মনে কত কষ্ট অনুভব করছেন! মাকে চিনতে পারলে'?

বৃদ্ধ বয়সেও অনেক সময় দাদাঠাকুর তামাশা করতেন দিদিঠাকরুণের সঙ্গে। দিদিঠাকরুণ ঘরে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করেছেন, দালানে ঘরের দোরগোড়ায় আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীর পা এঁকেছেন। তাই দেখে দাদাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—'এসব কি আঁকা হয়েছে?'

দিদিঠাকরুণ—'লক্ষ্মীর পা আঁকতে হয় আলপনা দিয়ে।'

দাদাঠাকুর—'লক্ষ্মীর পেঁচার পা এর চেয়েও ভাল হয়।'

এই নিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় দেখে দাদাঠাকুরের সেই ছেলেটি নিচু-গলায় বললে—'বাবা, অকারণে মায়ের সঙ্গে লাগেন।'

এই প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর বলেছিলেন 'এখন ব্রাহ্মণীর ভোট অনেক বেশি, সব ছেলে-মেয়েই মায়ের দিকে ভোট দেয়।'

দাদাঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমারের বড় ছেলে শ্রীমান অরিন্দমকে দাদাঠাকুর খুবই স্নেহ করতেন। বড় বৌমা (বিনয় কুমারের স্ত্রী) একদিন আনন্দ করে অমলকুমারকে (দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র) বলেন—'বাবা আমার ছেলেকে খুব ভালবাসেন।'

অমলকুমার শুনেই বললে—'নিজের ছেলেকে হাজতে পুরে দিলেন, আর তোমার ছেলেকে ভালবাসেন!'

পরে দাদাঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—একদিন ছাপাখানায় বসে কাজ করছি এমন সময় একটি দরিদ্র লোক অমলকুমারকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে হাজির হোলো। লোকটির হাতে একটি হাঁস, হাঁসটির চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। লোকটি জানালো অমলকুমার তীর-ধনুক দিয়ে হাঁসটির চোখ কানা করে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দাদাঠাকুর উঠে পড়লেন, ছাপাখানার দরজায় তালা-চাবি দিলেন। সেই লোকটিকে, অমলকুমারকে আর সেই হাঁসটিকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হলেন। দারোগাবাবু দাদাঠাকুরকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। দাদাঠাকুর গম্ভীর ভাবে বললেন যে তিনি অভিযোগ জানাতে এসেছেন—'এই দরিদ্র লোকটির হাঁসের চোখ এই ছেলেটি তীর-ধনুক দিয়ে কানা করেছে, রক্ত পড়ছে, একে হাজতে রাখুন।'

দারোগাবাবু তামাশা মনে করে বললেন—'এ তো আপনার ছেলে?'

আরো গম্ভীরকণ্ঠে দাদাঠাকুর বলেন—'যদি এই ছেলেটিকে ছেড়ে দেন তাহলে আমি এস. ডি. ও.-র (মহকুমা শাসক) কাছে নালিশ জানাবো।' তারপর সেই হাঁসের মালিকটিকে বললেন—'ছেলেকে থানায় দিয়েছি, এর বেশি আর কি করার আছে?'

পরে কোমলহৃদয় দাদাঠাকুর সেই দরিদ্র লোকটিকে হাঁসের জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

ওদিকে অনেকক্ষণ থানায় বসে থেকে বালক অমলকুমার কান্না শুরু করেছে। একখানি চিঠি লিখে দারোগাবাবু দাদাঠাকুরকে জানালেন—'এ শাস্তি আমারই হচ্ছে, দয়া করে একবার আসুন, ছেলেটিকে নিয়ে যান।'

দাদাঠাকুর চিঠি পেয়ে থানায় গেলে দারোগাবাবু জানালেন তাঁর অবস্থার কথা। বললেন—'দাদা, অমলকুমার থেকে থেকে কাঁদছে আর আমি একবার রসগোল্লা, একবার সন্দেশ—এই দিয়ে ভোলাচ্ছি। নিজেও শাস্তি ভোগ করছি আপনার ছেলের সঙ্গে।'

দাদাঠাকুর অমলকুমারকে গৃহে ফিরিয়ে আনলেন।

ছেলেবেলা থেকে দাদাঠাকুর জীবনে অনেক দুর্দিনের মধ্য দিয়ে কষ্ট সহ্য করে হাসি মুখে কাটিয়েছেন. কখনও কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নি। ছেলেবেলায় কয়েক মাইল পথ শীতে গ্রীষ্মে আর বর্ষার দিনে হেঁটে স্কুলে পড়তে গিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি এবং রসালাপ প্রায় প্রতিটি শিক্ষকমহাশয়কেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

একবারের ঘটনা, স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন স্কুল ইন্সপেক্টর। হেডমাস্টার মহাশয় তাঁকে খুশী করবার জন্যে বলেন, আপনি বড় উত্তম পুরুষ।'

নিকট থেকে দাদাঠাকুর বললেন—'না স্যার, আমাদের বাংলার স্যার শিখিয়েছেন যে, 'তুমি' বা 'আপনি' মধ্যম পুরুষ।'

হেডমাস্টার মহাশয়—'চুপ কর্, ডেঁপো ছেলে কোথাকার!'

এন্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হলেন দাদাঠাকুর। ছাত্র পড়িয়ে নিজের খরচ চালাতেন, মেসে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"...আমি যখন কাকার যত্নে চেষ্টায় সেকেণ্ড ডিভিশনে এনট্রান্স পাশ করে এফ. এ. পড়তে যাবো বলি তখন তিনি (রসিকলাল) বলেছিলেন—লেখাপড়া যদি চাকরি করার উচ্চাশায় করো, ভুল করবে। তাঁদের (বাবা ও কাকাদের) কোনো

এক শিক্ষক বলেছিলেন—'It is better to starve than to serve'. আমি চাকরি (প্রাইভেট মাস্টারী ছাড়া) করি নি। ছেলেদের চাকরি করতে দিইনি।" (চিঠির তারিখ ৭ আগস্ট ১৯৬৪)।

বর্ধমান রাজ কলেজে পড়ার সময় তাঁর মামা চিঠিতে জানালেন মামাতো ভাইয়ের উপনয়ন হবে। দাদাঠাকুর যেন বাঁধাকপি ও ফুলকপি নিয়ে উপনয়নের পূর্বে উপস্থিত হন। কথামতো বাঁধাকপি ও ফুলকপি নিয়ে রেলের কামরায় উঠে কপিগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে আলাদা আলাদা করে তৃতীয়শ্রেণীর কামরার ছাদের নিচে আংটায় ঝুলিয়ে রাখলেন। সাঁইথিয়া স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হতো এবং এক ঘণ্টা পরে গাড়ি ছাড়তো। টিকিট চেকার গাড়ির কামরায় উঠে আংটাতে ঝোলানো অনেকগুলি বাঁধা ও ফুলকপি দেখে জানতে চাইলেন—কপিগুলি কার। দাদাঠাকুর উত্তরে বলেন—কপি তিনি নিয়ে যাচ্ছেন মামাতো ভাইয়ের উপনয়ন উপলক্ষ্যে, লাগেজ করা হয়নি। টিকিট চেকার বলেন—'লাগেজ করার প্রয়োজন হবে না, তবে আমাকে দুটি কপি দিতে হবে।'

দাদাঠাকুর টিকিট চেকারকে বলেন—'আপনার পছন্দমতো দুটি কপি আপনি নিতে পারেন।'

পছন্দ মতো দুটি কপি নিয়ে টিকিট চেকার কামরা থেকে নেমে নিকটেই নিজের বাসস্থানে (রেল কোয়ার্টার) গেলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এসে কপি দুটি ফেরৎ দিলেন।

দাদাঠাকুর মনে ভাবলেন হয়ত বা কপি পছন্দ হয়নি। ফিরিয়ে দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে চেকার ভদ্রলোক বললেন—'মশাই, কেউ যদি কপি না খায় তাহলে কপি নিয়ে কি করবো ?'

দাদাঠাকুর তখন কপি না খাওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। চেকারটি একটু লজ্জিত হয়েই বলেন যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়নের কপি শুনে তাঁর স্ত্রী খেতে চান নি এবং ছেলে-মেয়েরাও কেউ খাবে না বলেছেন, অমঙ্গল হবে।

দাদাঠাকুর প্রশ্ন করেন—'মশাই, কোন্ অশুভ লগ্নে সেই দেবকন্যার সঙ্গে এই অসুরের বিবাহ হয়েছিল ?'

চেকার নীরব, নিরুত্তর থাকলেন। পরে অনেক গল্প করে চেকারটি জেনে নিলেন দাদাঠাকুর কবে এবং কোন্ গাড়িতে ফিরবেন। নির্দিষ্ট দিনে দাদাঠাকুরের ট্রেন স্টেশনে এলে সেই চেকার ভদ্রলোক একটি কামরার মধ্যে দাদাঠাকুরকে খুঁজে বের করলেন। তারপর বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন স্টেশন সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবার জন্যে। সেই অনুরোধে দাদাঠাকুরকে তাঁর বাড়িতে যেতেই হোলো, কারণ ভদ্রলোক আরও জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী দাদাঠাকুরকে দেখতে এবং তাঁর পায়ের ধুলো নিতে চান। দেবকন্যার সঙ্গে অশুভলগ্নে অসুরের বিয়ের কথা তাঁর মনে লেগেছে।

দাদাঠাকুর তাঁদের বাড়ি গেলে ভদ্রমহিলা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামী সেইদিন থেকে ঘৃণায় ঘুষ নেওয়ার কুপ্রবৃত্তি চিরদিনের, জন্য ত্যাগ করেছেন।

ঘুষ নেওয়া বা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা দাদাঠাকুর চিরদিনই অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন, অসহ্য বোধ করতেন।

গ্রামের এক দরিদ্র যুবক—জাতিতে কৈবর্ত, নাম—বিহারীলাল দাস, মনোহারী জিনিসের ব্যাবসা করেছিল। কয়েক মাস ব্যাবসা করার পর দুঃখ করে একদিন দাদাঠাকুরকে জানালো—প্রতি মাসেই তার লোকসান হচ্ছে। রেলের পার্শেলের বাক্স ভেঙে মাথায় মাখা সুগন্ধি তেল এবং আরও কিছু কিছু সৌখিন জিনিস নিয়মিতভাবে চুরি যায়।

দাদাঠাকুর তাকে অভয় দেন—লোকসান বন্ধ হবে, যদি সে দাদাঠাকুরের কথামতো কাজ করে।

যুবকটি রাজী হোলো।

দাদাঠাকুরের এক আত্মীয় বহরমপুর কলেজের কেমিস্ট্রীর (রসায়ন) অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাদাঠাকুর মাথার চুল উঠে যাওয়ার ঔষধ জেনে নিলেন—'Barium sulph'।

· দাদাঠাকুরের পরামর্শমতো সেই যুবকটি মাথার সুগন্ধি তেলে বেরিয়াম সাল্‌ফ মিশ্রিত করে কলকাতা থেকে রেলে পার্শেল করে নিজ ঠিকানায় পাঠালো। স্টেশন মাস্টার নিয়মিত পার্শেল খুলে ভালো জিনিস বের করে নিতেন, এবারেও মাথার তেল বের করে নিয়েছেন।

যুবকটি কয়েকদিনের মধ্যেই খবর নিয়ে এসে দাদাঠাকুরকে জানালে যে স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী এবং কন্যার সমস্ত চুল উঠে গেছে। স্টেশন মাস্টার মনের কষ্টে আছেন, মেয়ের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, বরপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে। সেই থেকে পার্শেল ভেঙে চুরি বন্ধ হোলো।

অনেকদিন আগের ঘটনা। একদিন ঘরে খাবার জিনিস কিছুই নেই, এমন কি টাকা পয়সাও নেই। সেটা বর্ষাকাল, সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। নিশ্চিন্ত মনে দাদাঠাকুর ও দিদিঠাকরুণ ঘরে বসে আছেন। ঐ বৃষ্টির মধ্যে এক জেলে যুবক, দাদাঠাকুরের বিশেষ পরিচিত, ছুটি ইলিশ মাছ নিয়ে দাদাঠাকুরের দাওয়ায় উপস্থিত হোলো। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, পথে ঘাটে কোনো লোক নেই, তাই যুবকটি ঘরে যাচ্ছে। দাদাঠাকুরকে অনুরোধ করলো একটা মাছ নেবার জন্যে, কিন্তু দাদাঠাকুর নারাজ হলেন, কারণ জানালেন পয়সা নেই। ছেলেটি মাছ রেখে গেল, বলে গেল—'বাবাঠাকুর, পয়সা পরে দেবেন।'

দাদাঠাকুর মাছ নিয়ে সংলগ্ন বাড়ির একটি ছেলেকে ঐ বৃষ্টির মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন। তাকে ইলিশ মাছের ভাগা নিয়ে যেতে বললেন আর বললেন—চার আনা পয়সা দিয়ে যেতে। ঐ চার আনা পয়সা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে দোকানে গেলেন তিনি, চাল ডাল কিনে আনলেন। ঘরে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা হোলো। পরমানন্দে ভোজন করে তুজনে সে রাত কাটালেন। কয়েকদিন পরে দাদাঠাকুর মাছের দাম পরিশোধ করেন।

প্রবল বর্ষায় ঘরের চালা থেকে জল পড়ছে, দাদাঠাকুর ছাতা

মাথায় দিয়ে ঘরের মধ্যে গান গাইছেন। দিদিঠাকরুণ বললেন—
'ঘরের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে বসে গান গাইছো!'

দাদাঠাকুর হেসে বললেন—'দেখ, ঘরের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকা খুব কম লোকের ভাগ্যে হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, লালগোলার মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা আর আমি—ঘরের মধ্যে ছাতা মাথায় বসি। ওঁদের সিংহাসনের মাথায় থাকে সোনা-রুপোর ছাতা আর আমার মাথার ওপর বাঁশের ছাতা।' এইভাবে কঠোর দারিদ্র্যকেও বিদ্রূপ করতে পারতেন দাদাঠাকুর।

একদিন শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—
'মা, ভগবানের কাছে কি চাইব? আমার জন্মের পূর্বেই আমার মাতৃস্তনে দুধ পাঠিয়েছেন, শিশুকে মাতৃস্তন চুষে দুধ পান করতে শিখিয়েছেন তিনি। জানো—মা দুর্গা তাঁর নিজের ছেলে গণেশের হাতি-মুখ সারাতে পারেন নি, শিবের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে পারেন নি—তাই আমি কি আর চাইবো মা-দুর্গার কাছে? শোনো—ভগবানের দুটো স্টোর (গুদাম) আছে। একটিতে থাকে সুখ অপরটিতে দুখ। আমি একাই ভগবানের দুখের স্টোর শেষ করে দেবো।—ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে Property. (ঐশ্বর্য) আর Poverty (দারিদ্র্য), সামান্য তফাত আছে বানানে। তবে কথাটা প্রায় একই। অন্যের আছে Property, আমার আছে Poverty। তবে আমি নিজেকে Cheap (নগণ্য) মনে করি না, মনে করি আমি Chief (প্রধান)। I first person, singular number, always Capital, never takes help of another alphabet।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের জোর ছিল দাদাঠাকুরের অসাধারণ। একদিন সকালে ঘরের কোন পূজোর জন্যে দিদিঠাকরুণ

একটি টাকা চাইলেন দাদাঠাকুরের কাছে। সেদিন দাদাঠাকুরের হাতে একটিও টাকা ছিল না। সেকথা দিদিঠাকরুণকে জানালেন না, দিদিঠাকরুণের কোন কাজে বা কোন ইচ্ছায় তিনি কখনও কোন রকম বাধা দিতেন না বা মানা করতেন না। এমনই ছিল তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসা।

সেই সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিশেষ পরিচিত একটি ভদ্রলোকের কাপড়ের দোকানে গিয়ে বসলেন। ভদ্রলোক সবেমাত্র দোকানটি খুলেছেন। দাদাঠাকুরকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন তিনি। ভদ্রলোক নিজেই দোকান পরিষ্কার করে গঙ্গাজল ছিটোলেন। এদিকে দাদাঠাকুর তাঁর দোকানের ধুনোচিটি নিয়ে তাতে টিকে ধরিয়ে ধুনো প্রস্তুত করেছেন। উদ্দেশ্য—দোকানদারের বউনি (প্রথম বিক্রি) হলেই দুটো টাকা ধার চাইবেন। ভদ্রলোকের কাছে আগেও দুটি টাকা ধার নিয়েছিলেন—পরিশোধ করা হয়নি। আবার দুটো টাকা ধার চাইতে খুবই লজ্জিত হচ্ছেন নিজের কাছে। বলতেন,—'ভাই, মনটা বলছে টাকা দুটো চাইতে আর প্রাণটা বলছে—টাকা চাইলেই আমি বেরিয়ে যাবো।'

এই মনের দ্বন্দ্বের মধ্যে সময় কাটলো বেশ খানিকটা। দেখতে দেখতে বেলাও হয়েছে। এমন সময় পোস্ট আপিসের পিওন দাদাঠাকুরকে সেই দোকানে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললে—'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে না পেয়ে আপনাকে খুঁজছিলাম। আপনার নামে দশ টাকার মনিঅর্ডার আছে। ক্রসওয়ার্ড পাজল সল্‌ভ করে পুরস্কার পেয়েছেন।'

মনিঅর্ডার সই করে দশটি টাকা নিলেন। তার থেকে তখনি সেই দোকানদারটিকে পূর্বের ধারের দুটি টাকা পরিশোধ করে বললেন—'ভোরবেলায় দুটো টাকা ধার করতে এসেছিলাম। আমি কি কোনদিন ধুনো দিতে আসি? উদ্দেশ্য ছিল—তাড়াতাড়ি ধুনো দিয়ে কাজ এগিয়ে রাখি, বউনি হলেই দুটি টাকা চাইব।'

অনেকবার দাদাঠাকুরের মুখে শুনেছি 'Unseen hand work করে।'

বহুদিন পূর্বে একবার Electoral Roll ছেপে এককালীন আঠার শ' টাকা পেয়েছিলেন। বলতেন—'চল্লিশ বছর বয়স অবধি এক শ' টাকা নিজের বলে কখনো দেখিনি।' সেই আঠার শ' টাকা একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে সারারাত জেগে গান গেয়ে কাটিয়েছিলেন, পাছে চোর আসে এই আশঙ্কায়। পরে আরও কিছু টাকা উপার্জন করে একটি নিজস্ব বসতবাড়ি করার ইচ্ছা হোলো। তাঁর বর্তমানের বসত-বাড়িটি ছিল পাকুড়ের রাণীর সম্পত্তি। খবর নিয়ে জেনেছিলেন পাকুড়ের রাণী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা স্বনামধন্যা সাহিত্যিকা ও সম্পাদিকা সরলাদেবী চৌধুরাণীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এবং পাকুড়ের রাণী সরলাদেবীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। সরলাদেবী দাদাঠাকুরকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন, দাদাঠাকুরও সরলাদেবীকে 'দিদিমণি' বলতেন। খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের। সরলাদেবীকে দাদাঠাকুর জানালেন, পাকুড়ের রাণীর বাড়িটি নিজের বসবাসের জন্য কিনতে চান, এও জানালেন তাঁর নিজের মূলধন কত। যদি রাণীমা বিক্রি করেন তাহলে দাদা-ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। সরলাদেবী পাকুড়ের রাণীকে সব কথা পত্র মাধ্যমে জানালেন, সেই সঙ্গে দাদাঠাকুরের পরিচয়ও বিশেষভাবে দিলেন। পাকুড়ের রাণী সরলাদেবীর পত্রের উত্তরে জানালেন যে, ঐ বাড়ি তিনি দাদাঠাকুরকে দান করে কৃতার্থ হতে চান। সব কথা সরলাদেবী দাদাঠাকুরকে জানালেন। দাদাঠাকুর টাকা দিয়ে বাড়ি কিনতে চান নিজের সামর্থ্যের মধ্যে, তিনি কারুর দান গ্রহণ করবেন না। দাদাঠাকুরের মনের কথা পরিষ্কারভাবে সরলাদেবী পাকুড়ের রাণীকে জানালেন। রাণী চিঠি পেয়ে নিজ কর্মচারীদের এবং নিজ এস্টেটের উকিলবাবুকে সমস্ত দলিলপত্র শীঘ্র প্রস্তুত করে ঐ টাকার মধ্যে দাদাঠাকুরকে বাড়িটি বিক্রি করার

আদেশ দিলেন। সেই অবধি পাকুড়ের রাণী দাদাঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, তাঁর নির্লোভ চরিত্রের জন্য। দাদাঠাকুর বলতেন —'সরলাদেবীর জন্যে বাড়ি হোলো।' পরে ছাপাখানার বাড়ি, ফলের বাগান ইত্যাদি কিনেছিলেন। সৎপথে উপার্জন করেই সমস্ত দায়দায়িত্বপূর্ণ কাজ শেষ করেন। পরশ্রীকাতরতা, লোভ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কখনো তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

বলতেন—'আমি গরীব, কৃপণ নই।' তামাশাচ্ছলে বলতেন—'ছেলেবেলায় কালাজ্বর হয়েছিল, Antimony injection দিয়ে কালাজ্বর সারলো কিন্তু দারিদ্র্য (anti-money)-ব্যাধিগ্রস্ত হলাম।'

বিখ্যাত কাগজ ব্যাবসায়ী ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দাদাঠাকুর কলকাতায় এসে তাঁর বাড়িতে দেখা করেন, এবং সেই সময় ছেচল্লিশ টাকা দামের কাঠের একটি পুরানো ছাপার যন্ত্র সরঞ্জামাদিসহ কিনেছিলেন দত্ত মহাশয়ের সহযোগিতায়। এরপর ভোলানাথবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ দত্ত মহাশয় একখানি 'প্রিণ্টার্স গাইড' কিনে দিয়েছিলেন ছ'আনা দামের। এতে দাদাঠাকুরের বিশেষ সুবিধা হোলো ছাপাখানার কাজ চালানোর।

তখন দাদাঠাকুর দফরপুরে বসবাস করেন।

১৯১৩ সালে কলকাতার কোন একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দাদাঠাকুর কলকাতায় এসে বিজ্ঞাপনদাতা একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন।

সাহেবটি দাদাঠাকুরকে দেখে প্রথমে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। উপহাস করে তিনি দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন—'Are you coming from jungle ?'—(তুমি কি জঙ্গল থেকে আসছো ?)

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'Yes, I am coming from jungle (আমি জঙ্গল থেকেই আসছি।)—আমার প্রয়োজন ছাপার জন্যে অল্প দামে ভালো একটি মেসিন।'

বিস্মিত সাহেব আরও বিস্মিত হলেন—খালি পা, হাঁটুর উপরে কাপড় পরা, গায়ে জড়ানো চাদর, বগলে ছাতা এবং হাতে ঝোলানো টিনের বাক্স—এই চেহারার দাদাঠাকুরের কাছ থেকে সঠিক আর চট্‌পট ইংরাজি ভাষায় উত্তর শুনে। তখন সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন—'আপনার ঐ টিনের বাক্সটিতে কি আছে?'

দাদাঠাকুর বললেন—'Smoking apparatus'।

সাহেব তখন দেখতে চাইলেন দাদাঠাকুরের ধূমপানের সরঞ্জামগুলি। দু-মুখো একটি টিনের কৌটো, তারই একধারে তামাক, অন্য ধারে টিকে, মধ্যে চকমকি ও শোলা। কৌটোটি খুলে সেই সব বের ক'রে সাহেবের সামনে রেখে বললেন—'এই আমার ধূমপানের ব্যবস্থা।'

সাহেব তখন দাদাঠাকুরকে অনুরোধ করলেন তাঁর সামনে বসে ধূমপান করতে।

কল্কেতে তামাক টিকে সাজিয়ে, বাঁ হাতের চকমকি পাথরে লোহা দিয়ে ঠুকে শোলাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ফেলে সেই আগুন দিয়ে টিকে ধরালেন দাদাঠাকুর। তারপর সাহেবের কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে নিজের হাতের তামাকের দাগ ধুয়ে সাহেবের দেওয়া তোয়ালেতে হাত মুছে তিনি শুরু করলেন তাঁর ধূমপান পর্ব।

ধূমপান শেষ হতে দাদাঠাকুরকে সাহেব অনুরোধ করলেন—'আপনার ঐ আগুন ধরানোর কৌশলটি আমাকে শেখাতে হবে।'

দাদাঠাকুর তখন সাহেবের বাঁ হাতে চকমকি পাথর ধরতে দিলেন এবং ডান হাতে লোহাটি ঠিক মতো ধরে ঠোকা মারার কায়দা দেখিয়ে বললেন—'এইভাবে আপনি নিজে চেষ্টা করে শোলাতে আগুন ফেলুন।'

দু'চারবার চেষ্টার পরই সাহেব কৃতকার্য হলেন, তখন তাঁর কি উল্লাস! আনন্দিত হয়ে সাহেব দাদাঠাকুরকে বললেন—'কি রকম প্রেস আপনার কাজে লাগবে গুদামে গিয়ে দেখবেন চলুন, আমি সব দেখাবো আপনাকে।'

গুদামে অনেক রকমের ছাপার মেসিন দেখলেন দাদাঠাকুর। সব দেখার পর তিনি সাহেবকে বললেন—'পছন্দসই জিনিস তো দেখলাম, কিন্তু পছন্দ হোলে কি হবে, বেশি দামে কেনার ক্ষমতা যে নেই আমার।'

সাহেব বললেন—'যেটা আপনার পছন্দ এবং প্রয়োজন আপনি নিঃসঙ্কোচে সেই মেসিনটাই নিয়ে যান।—দামের জন্যে কোনো চিন্তা নেই।—যা পারবেন এখন দিন, বাকিটা যতদিনে পারবেন দেবেন। আপনার জীবদ্দশায় যদি সেটাও সম্ভব না হয়, ছেলেদের বলে রাখবেন—তারা শোধ করবে আমার অবর্তমানে আমার ছেলেদের কাছে।'

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'আমার সাধ্যের বাইরে আমি যাবো না আর নিজেকে আমি ঋণী করে রাখবো না।'

দাদাঠাকুরের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সাহেবটি তখন নানান জায়গায় ফোন করে সন্ধান করতে লাগলেন এবং শেষে এক জায়গায় সন্ধান পেয়ে নিজের গাড়িতে করে দাদাঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে এক শ টাকা দামে একটি মেসিন কিনে দিলেন। সেই মেসিন তিনি রঘুনাথ-গঞ্জে নিয়ে গেলেন।

ছাপাখানার জন্য দাদাঠাকুর আড়াই টাকা ঘর ভাড়া দিতেন তখন—রঘুনাথগঞ্জে। রঘুনাথগঞ্জ শহরেই আদালত, থানা ও অন্যান্য সরকারী আপিস। দাদাঠাকুরের ছাপাখানা এই রঘুনাথগঞ্জেই 'পণ্ডিত প্রেস' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৩ সালে।

ছাপাখানার একজন কম্পোজিটার ছিল হাবা এবং বোবা।

একসময় দাদাঠাকুর হাবা-বোবাদের জন্য একটি সান্ধ্যকালীন পাঠশালা করেছিলেন এবং তিনি নিজেই সেই পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন।

১৩২১ সালে দাদাঠাকুর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন, নাম দিলেন "জঙ্গিপুর সংবাদ"। সে সম্বন্ধে দাদাঠাকুরের নিজের লেখা—

জঙ্গিপুর সংবাদের জন্মকথা

বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে বাধে এমন সময়ে তৎকালীন জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারী বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করবার মতলবে কাগজখানি প্রকাশের অনুমতির জন্য আবেদন করেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়। নিজেকে 'বনেদী কাঙাল' বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করায় জেলা শাসক সাহেব তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শাসক শ্রীগুরুদাস সরকার মহাশয়দ্বয়কে উক্ত বিশেষণ দেখাইয়া মন্তব্য করেন—বনেদী বড়লোক কথা অনেক শুনেছি কিন্তু কাগজের জামিনের টাকা দাখিল করার অক্ষমতা জানাবার সময় এই 'বনেদী' শব্দের নূতনত্ব আছে। সাহেব বিনা জামিনে কাগজখানি প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

জঙ্গিপুর সংবাদে দাদাঠাকুর দেশের ও সমাজের কথা লিখতেন রসালাপের মাধ্যমে। পরে নীলামের ইস্তাহার ছাপা হোতো সেই কাগজে। এখনও হয়। তখন প্রতি মাসেই মুন্সেফের আদালতের কর্মচারীর কাছে গিয়ে নীলামের ইস্তাহার ছাপার টাকা নিয়ে আসতেন। আদালতে যাতায়াতের খরচ বাবদ এক টাকা অনুমোদিত ছিল। নূতন এক মুন্সেফবাবু বদলি হয়ে এসে ঐ একটি টাকাও বন্ধ করে দিলেন। দাদাঠাকুর তাঁকে বলেন—'আমি হেঁটে আসি, হেঁটে ফিরে যাই, অনুমোদিত ঐ টাকাটি যদি আপনি বন্ধ করেন, আমার আপত্তির কোন কারণ নেই।'

একদিন সকালে মুন্সেফ-আদালতে গিয়ে টাকা নিয়েছেন—প্রায় আশি/নব্বই টাকা। টাকা নিয়ে যখন আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন তখন দ্বিপ্রহর। দেখলেন গাছতলায় একটি অতি দরিদ্র মধ্য বয়সী মেয়ে আকুল হয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদছে আর তার মুখে একই

কথা—'শরৎ পণ্ডিত নিব্বংশ হোক, আমার বাড়ি-ঘর-দোর নীলাম করে আমাকে রাস্তায় এনেছে! দাদাঠাকুরের কানে কথাগুলি পোঁছলো। তিনি সেই মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও মেয়েটি সেই একই কথা বুক ফাটা কান্নার সঙ্গেই বার বার বলছে।

দাদাঠাকুর বুঝলেন, মেয়েটি তাঁকে চেনে না। দাদাঠাকুর মেয়েটিকে বললেন—'মা, কেঁদো না। তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার কী নীলাম হয়েছে? স্বামীর নাম কী? কার কাছে দেনা হয়েছে? কত টাকা ধার ছিল?' ইত্যাদি প্রশ্ন করে সব খবর জানলেন। মেয়েটিকে বললেন—'তুমি কেঁদো না, এই গাছ তলাতেই আমি না আসা অবধি বসে থাকো।'

দাদাঠাকুর আবার আদালতের উকিলদের বসবার ঘরে ফিরে গেলেন। মেয়েটির কাছে জেনে নিয়েছেন পাওনাদার কুম্ভকারের নাম, তারই উকিলকে ডেকে দাদাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—এই বিধবা মেয়েটির স্বামীর কাছে পাওনা টাকা সুদে আসলে কত হয়েছে সেই কুম্ভকারের। উকিলকে জানালেন সমস্ত টাকা এই মুহূর্তে তিনি দেবেন এবং নীলাম বন্ধ করতে হবে। সেই উকিল দাদাঠাকুরকে মামা বলে সম্বোধন করতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। দাদাঠাকুর উকিলের সঙ্গে মুন্সেফ-আদালতে গেলেন, এবং টাকা পরিশোধ করে নীলাম তুলে নিতে অনুরোধ করলেন। মুন্সেফ অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর টাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে সমস্ত দলিল পত্রাদি নিয়ে এসে সেই মেয়েটিকে দিয়ে বললেন—'তোমার বাড়ি নীলাম হয়নি, এই কাগজপত্রগুলো যত্ন করে বাড়ি নিয়ে যাও, এর সঙ্গে টাকার রসিদও আছে সাবধানে রেখো।' মেয়েটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—'তাহলে নীলাম হয়নি?'

দাদাঠাকুর—'না।'

দাদাঠাকুর ফিরে এলেন প্রায় বেলা দুটোর সময়। মাথায় একটু তেল মেখে গঙ্গায় স্নান করতে যাবেন এমন সময় সেই মেয়েটি

বুকফাটা কান্না কাঁদতে কাঁদতে একেবারে দাদাঠাকুরের বাড়ির ভেতর এসে উঠোনে বসে পড়ল। কেবল কাঁদে আর বলে—'বাবা, আমি না জেনে আপনাকে কত গালাগালি দিয়েছি, আমায় ক্ষমা করুন, না হলে আমার অপরাধের জন্যে আমাদের সর্বনাশ হবে। আমাকে লোকে বললে—শরৎ পণ্ডিত তোর ভিটে নীলাম করে দিয়েছে।'

মেয়েটি যখন বাড়ির উঠোনে বসে ঐ সব কথা বলছে দাদাঠাকুর তখন অবাক হয়ে গিয়েছেন, তাকে দেখে। দাদাঠাকুর নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে নিরুপায় হয়ে কৌশল অবলম্বন করলেন। মেয়েটিকে বললেন একটু বিরক্তির ভান করে—'কি জন্যে এখানে এসেছিস ? যা বাড়ি যা।'

দিদিঠাকরুণ রান্না করছিলেন—কান্নার শব্দে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন উঠোনে একজন মধ্য বয়সী মেয়ে বসে কাঁদছে। দিদিঠাকরুণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন দাদাঠাকুরকে—'মেয়েটি কে ?'

এড়িয়ে যাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দাদাঠাকুর—'পাগল, পাগল !'

দাদাঠাকুরের কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া হলো না পাগল বলে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতেই দিদিঠাকরুণকে বললে—'মা, আমি পাগল নয়, বাবা আমার সমস্ত ধারের টাকা শোধ করে বাড়ির নীলাম বন্ধ করেছেন। লোকে আমায় বলেছিল—শরৎ পণ্ডিত তোর বাড়ি নীলাম করেছে। আমি না জেনে বাবাকে গালাগালি দিয়েছি, যদি বাবা ক্ষমা না করেন তাহলে আমার আর আমার বংশের সর্বনাশ হবে।'

দিদিঠাকরুণকে যারা না জানে তারা ধারণা করতে পারবে না যে, তিনি কত মহৎ-প্রাণ, কত সহিষ্ণু। সব শুনে তিনি বললেন—'তা তোর সব মিটে গেছে ?—তবে কাঁদছিস কেন—এখন বাড়ি যা।'

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দিদিঠাকরুণের মনে পড়েছে—বেলা হয়েছে। মেয়েটিকে বললেন—'একটু জল খেয়ে যা, অনেক বেলা হয়েছে।' এই বলে গুড়-মুড়ি আর জল দিলেন মেয়েটিকে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করি—দাদাঠাকুর প্রায়ই বলতেন—'তোদের দিদিঠাকরুণ মুড়ি ভাজায় এম. এ.।'

যাইহোক মেয়েটি মুড়ি-গুড়-জল ইত্যাদি পেয়ে শান্ত মনে খেতে খেতে লক্ষ্য করেছে দাদাঠাকুরের বাড়ির অবস্থা। তখন দাদাঠাকুরের দৈন্যের মধ্যে দিন কাটে। বাসন বলতে ঘরে আছে মাত্র দুটি থালা, দুটি গেলাস আর হাঁড়ি, কড়া, ইত্যাদি। দাদাঠাকুর বলতেন—'ভাই, থালাগুলো মেজে মেজে জাপানী সিল্ক হয়ে গেছল।' মেয়েটি লক্ষ্য করেছে—দাদাঠাকুরের একটি ছেলের ভাত খাওয়া হলে দাদাঠাকুরের বড় মেয়ে ইন্দু তাড়াতাড়ি থালাটি মেজে নিয়ে আর একটি মেয়েকে ভাত দিয়েছে। অনেকবার থালা মেজে ভাত পরিবেশন দেখে নীরবে মেয়েটি ফিরে গেল।

বিকেলবেলায় মেয়েটি আবার এলো, হাতে তার কুড়ি-পঁচিশখানা বড় বড় পদ্মপাতা। দিদিঠাকরুণকে বললে—'মা, যতদিন শক্তি থাকবে এই পাতা আমি এনে দেবো, আমার দিদিকে আর থালা মাজতে হবে না।'

দাদাঠাকুর বলতেন—'সেই মেয়েটি অনেক দিন পর্যন্ত পাতা দিয়ে যেতো, মানা করলেও শুনতো না।'

ওদিকে আদালতে দাদাঠাকুরের এই ঘটনার কথা অল্প সময়ের মধ্যেই বায়ুর মতো রটে গিয়েছিল। যে নতুন মুন্সেফবাবু দাদাঠাকুরের যাতায়াতের টাকা বাদ দিয়েছিলেন তিনি দাদাঠাকুরকে জানালেন যে, তাঁর টাকা কেটে পাপ বাড়াতে তিনি নারাজ। কারণও জানালেন যে, যাঁকে এইভাবে অচেনা-অজানা-অসহায় দুঃখী-দরিদ্র মানুষের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে নিজের অবস্থাকে ভ্রূক্ষেপ না করে অর্থব্যয় করতে হয়, তাঁর টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

হাতিবাগানের বাড়িতে একবার দাদাঠাকুরের অনাড়ম্বর এক

জন্মদিনে শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্র, লবকুমার, অমল মিত্র এবং আরও দু-একজন আনন্দ করেছিলেন দাদাঠাকুরের অনুমতি নিয়ে। শ্রীমতী পদ্মাবতী দাদাঠাকুরের কপালে চন্দন তিলক দিলেন, লবকুমার পরালো মালা। সামান্য মিষ্টান্ন সেই আনন্দে একমাত্র উপভোগ্য ছিল। সেদিন প্রফুল্ল মনে নিজের জীবনের একটি মূল্যবান ঘটনা বলেছিলেন দাদাঠাকুর—

১৩২১ সালের কার্তিক মাস। মুর্শিদাবাদ জেলায় কলেরার মহামারী দেখা দিল। বহু লোক মারা পড়লো। দাদাঠাকুরের একটি ছেলেও কলেরায় মারা গেল। এই সময়ে শোকাতুরা দিদিঠাকরুণ একদিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে দাদাঠাকুরকে জানালেন যে, নদীর ওপার থেকে নৌকো করে এসে স্কুলের দপ্তরী নামল, সঙ্গে তার সব মালপত্র ছিল। ঘাটের লোকেদের জানালো যে, কলেরার জন্যে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, সব লোকজন চলে গেছে। হোস্টেলে পোস্ট আপিসের পিওনের একমাত্র ছেলে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। হোস্টেলও বন্ধ।

শুনেই দাদাঠাকুর বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি দুটি ভাত দাও, খেয়ে ওপারে যাবো পিওনের ছেলেটির কাছে, কলেরা রুগীর কাছে খালি পেটে যেতে নেই।'

দিদিঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন—'এখুনি যাবে?'

দাদাঠাকুর—'হ্যাঁ, শুনলাম তার কাছে যখন কেউ নেই।'

ভাত খেয়ে দাদাঠাকুর সঙ্গে ক'টা টাকা, কারবলিক সাবান, বাতি, দেশলাই, বিড়ি, তামাক এবং অনেক ছেঁড়া কাপড় নিয়ে গেলেন শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নিলেন কলেরা রুগীর সেবার কাজ কিভাবে করতে হবে। পূর্ণবাবু বলে দিলেন—'বরফের টুকরো রুগীর মুখে মাঝে মাঝে দেবে, মাটির কলসী ধুয়ে তাতে পরিষ্কার জল রাখবে আর ছেঁড়া কাপড় রুগীর বিছানায় পেতে

রাখবে। কলেরার মল যে কাপড়ে লাগবে সে কাপড় মাঠে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।'

পূর্ণবাবুর নির্দেশানুযায়ী একটি মাটির কলসী আর কিছু বরফ নিয়ে দাদাঠাকুর হোস্টেলে প্রবেশ করে দেখেন পিওনের ছেলেটি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে, ঘর ফাঁকা।

মাটির কলসী ধুয়ে পরিষ্কার জল রাখলেন দাদাঠাকুর। ছেলেটির মুখে চোখে জল দিতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির জ্ঞান হলো। করুণভাবে দাদাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সে বললে—'আপনি ? আমি বাঁচবো।' সান্ত্বনা দিয়ে দাদাঠাকুর পূর্ণবাবুর নির্দেশ মতো কাজ করতে লাগলেন। মলযুক্ত কাপড় মাঠে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন, কারবলিক সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেলেন। মাঝে মাঝে ছেলেটির মুখে বরফের টুকরো দেন।

অল্পক্ষণ পরে স্থানীয় জমাদারের স্ত্রী এসে দাঁড়ালো, দাদাঠাকুরকে বললে—'বাবা, কাপড় আমি পুড়িয়ে দেবো—আপনাকে আর ও কাজ করতে হবে না—আমি খবর পেলাম আপনি এসেছেন।'

নিয়মিতভাবে জমাদার-পত্নী তার কাজ করতে লাগল। সন্ধ্যার সময় একা বসে বসে বিড়ি টানছেন দাদাঠাকুর। ঘরের দরজা খোলা, বাইরের অন্ধকারে দেখলেন সাদা মতো কি একটা ঘরের দিকে আসছে। ভীতকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কে···এ···এ···এ !'

উত্তর এলো বামাকণ্ঠে—'বাবা, আমি।' ঐ গ্রামেরই এক বিধবা। দাদাঠাকুর সেবা করছেন শুনে সেও সেবার সৌভাগ্যের ভাগ নিতে এসেছে। মেয়েটি দাদাঠাকুরকে বললে—'বাবা, আপনি সারাদিন এখানে আছেন, এবার বাড়ি যান, আমি তো আছি !'

দাদাঠাকুর তার কথায় আনন্দিত হয়ে বললেন—'তুই তাহলে থাক—আমি আবার আসছি।'

এপারে এসে গঙ্গায় ডুব দিয়ে দাদাঠাকুর রাত্রে বাড়ি ফিরলেন। কিছু খেয়ে আবার রুগীর কাছে গেলেন।

ছেলেটির বাবা আসামের এক পোস্ট অফিসে বদলি হয়েছিল, তাকেও টেলিগ্রাম করে খবর দিতে ভোলেন নি দাদাঠাকুর। পূর্ণবাবুর চিকিৎসায়, দাদাঠাকুর, ঐ বিধবা মেয়েটি আর জমাদারের স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষায় অল্প দিনেই ছেলেটি সুস্থ হলো। পূর্ণবাবু ছেলেটিকে ভাত খেতে অনুমতি দিলেন।

দুঃসংবাদ পেয়ে ছেলেটির বাবা-মা আসাম থেকে চলে এলেন। দাদাঠাকুর ছেলেটির বাবাকে ভাত দিতে বললেন। ভাত খাবে শুনে ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেটি বললে—'আমি আপনার বাড়ি ভাত খাব।'

দাদাঠাকুর বললেন—'তোর বাবা-মা এসেছে, এখন বাড়ি গিয়ে ভাত খাবি, পরে আমার বাড়িতে একদিন খাস।'

ছেলেটি সে কথা শুনবে না, বায়না ধরল, বললে—'না, আমি আপনার বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

দাদাঠাকুর নিরুপায়, তার বাবা-মাকে নিয়ে বাড়িতে এলেন। এবং তারা সকলে খেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরে গেল।

সেই সময় দাদাঠাকুর জ্বর গায়ে কলেরায় মৃত অনেক রুগীকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছেন। পরে আর এক সময় জ্বর গায়েই যখন শ্মশানে যাচ্ছেন, তখন পুত্র বিনয়কুমার নিজে গেলেন শ্মশান ঘাটে, পিতৃদেবকে আর যেতে দিলেন না।

'আলস্য' শব্দটা দাদাঠাকুরের জীবনাভিধানে ছিল না। কোনো কাজই তিনি ফেলে রাখতেন না। দরকার হলে বিশ্রাম ভুলে রাত জেগেও কাজ করতেন। গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে লণ্ঠন জ্বেলে লিখতে বসতেন রাস্তার ধারের বারান্দায়। এক রাত্রে লিখতে বসেছেন এমন সময় দেখলেন পথ দিয়ে একটি লোক মাথায় একটি বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলেছে। দাদাঠাকুর তাকে প্রশ্ন করলেন—'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?'

উত্তরে লোকটি বললে—'বাবু, রেল ধরতে ইস্টিশনে যাচ্ছি।'

দাদাঠাকুর লিখতে শুরু করলেন। মনে কিন্তু সন্দেহ হলো—এত রাত্রে তো কোন ট্রেন নেই! সেই সন্দেহ নিয়ে তিনি লণ্ঠন হাতে থানায় গেলেন। দারোগাবাবু অত রাত্রে দাদাঠাকুরকে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'এত রাত্রে, কি ব্যাপার!'

দাদাঠাকুরের মুখে শুনলেন ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে সন্দেহজনকভাবে একটি লোক গিয়েছে। দারোগাবাবু মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে চারধার দিয়েই কয়েকজন সিপাই পাঠালেন লোকটির সন্ধানে। সিপাইরা এক নির্জন গাছতলায় ট্রাঙ্কটিকে ভেঙে মালপত্র বের করতে দেখল একজনকে। মালপত্র ও ভাঙা ট্রাঙ্ক সমেত থানায় নিয়ে এলো তাকে। দারোগাবাবু লোকটিকে প্রশ্ন করলেন—'তুই চুরি করতে গিয়েছিলি?—তোর সঙ্গে আর কে ছিল?'

সোজা দাদাঠাকুরকে দেখিয়ে লোকটি বললে—'আমার সঙ্গে ছিল।' দারোগাবাবু হেসে ফেললেন। সিপাইরা তখনি তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ফটকে ভরে রাখল।

এক সময় শ্রীগুপ্ত নামে এক দাম্ভিক মহকুমা শাসক (এস-ডি-ও) এলেন জঙ্গীপুরে। তিনি কি কারণে জানি না দাদাঠাকুরের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। দাদাঠাকুরের কোন কিছুই তাঁর পছন্দ হতো না। তিনি দাদাঠাকুরকে জব্দ করার মনস্থ করলেন। চেষ্টা করে নীলামের ইস্তাহার 'জঙ্গীপুর সংবাদ'-এ দেওয়া বন্ধ করলেন।

দাদাঠাকুরও সহজে ছেড়ে দেবার মানুষ ছিলেন না। নিজের তেজস্বিতার অভাব কোনদিন দেখা যায়নি তাঁর। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন শ্রীগুপ্ত ট্যুরে যান রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অথচ সরকারের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করেন। এক-দিন এস-ডি-ও ট্যুরে গেলে চুপি চুপি ইস্টিশনে গিয়ে দাদাঠাকুর

এস-ডি-ও'র কেনা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের নম্বর এবং কোন্ ইস্টিশনের টিকিট লিখে নিয়ে এলেন। ঐ একখানি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি হয়েছিল সেদিন। এস-ডি-ও ট্যুর থেকে ফিরে এলে দাদাঠাকুর আবার গিয়ে নম্বর জেনে এলেন। তার কয়েকদিন পরেই দাদাঠাকুর নিজে গেলেন তদানীন্তন ইংরেজ ওপরওলা আই-সি-এস মিঃ প্রেন্টিসের কাছে। সমস্ত ঘটনা শুনে সাহেব বিস্মিত হলেন, এবং দাদাঠাকুরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। আবার নীলামের ইস্তাহার ছাপার অনুমতি পেলেন তিনি। পরে ঐ এস-ডি-ও'র সঙ্গে অনেক রকম গণ্ডগোল হয়েছিল, তিনি নাজেহাল হয়েছিলেন দাদাঠাকুরের কাছে।

একদিন একই নৌকোয় ওই এস-ডি-ও, দাদাঠাকুর এবং গ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক নদী পার হচ্ছিলেন। দাম্ভিক এস-ডি-ও দাদাঠাকুরকে শুনিয়ে দুজনেরই পরিচিত এক ভদ্রলোককে বললেন—'আমরা দু'পুরুষের হাকিম।'

এস-ডি-ও'র কাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

একথা শুনে দাদাঠাকুর সেই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে বলেন, 'কুতুবউদ্দিনের বংশ—Slave dynasty।'

একসময় এস-ডি-ও বদলি হয়ে গেলেন। এবং তিনি অবসর গ্রহণ করার পরে একদিন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুজনেরই পরিচিত এক রোগীর কক্ষে আবার দেখা হয়ে গেল। শ্রীগুপ্ত দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—'পণ্ডিত মশাই, আপনি আদা-জল খেয়ে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি আপনার কি ক্ষতি করেছিলাম সেই কারণটি জানতে পারি?'

দাদাঠাকুর উত্তরে বলেন—'বাঘে কি সকলের ছেলেকে খায়? কিন্তু বাঘ দেখলেই সকলে বল্লম নিয়ে, লাঠি নিয়ে এক সঙ্গে 'মার মার' বলে তেড়ে যায় কেন?'

এস-ডি-ও নীরব রইলেন।

কয়েক বছর পরে নতুন এক এস-ডি-ও এলেন জঙ্গীপুরে। তিনি দাদাঠাকুরের কথা লোক পরম্পরায় শুনেছিলেন, আলাপ করার বিশেষ ইচ্ছা হলো। তাই একদিন সকালে চাপরাসী পাঠালেন। দাদাঠাকুর চাপরাসীটিকে চিনতেন, প্রশ্ন করলেন—'কি খবর?'

চাপরাসীটি জানালো—'নতুন এস-ডি-ও সাহেব একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

দাদাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—'Warrant এনেছিস? Warrant নিয়ে এলে আমি যাবো, আমার বাবাও যাবে এস-ডি-ও'র কাছে। —তা না হলে এস-ডি-ও'কে বলিস—আমি কারো চাক্‌রি করি না।'

চাপরাসীটি ফিরে গিয়ে জানালে—দাদাঠাকুর দেখা করতে আসবেন না। এস-ডি-ও'র মনে সন্দেহ হলো—কিছু ত্রুটি হয়েছে হয়ত। চাপরাসীকে অভয় দিয়ে সব জানলেন। বিকেলে ধুতি ও হাফহাতা শার্ট পরে দাদাঠাকুরের ছাপাখানায় উপস্থিত হলেন, রাস্তায় দাঁড়িয়েই বিনীতভাবে বললেন—'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি, তবে আমার ভুল ত্রুটীর জন্যে ক্ষমা করবেন।'

দাদাঠাকুর এস-ডি-ও'কে বসতে বললেন। তিনি কাগজের রীমের ওপর বসে বললেন—'চাপরাসী পাঠিয়ে ভুল করেছি, নিজে আসাই উচিত ছিল।'

দাদাঠাকুর বললেন—'যদি চাপরাসীর কোলে আপনার যে ছেলেটি কথা বলতে পারে না, সেও থাকতো তাহলে বুঝতাম আপনার Representative এসেছে।'

যাইহোক পরে এস-ডি-ও'র সঙ্গে দাদাঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা খুবই হয়েছিল। এর পর থেকে এস-ডি-ও চাপরাসীর সঙ্গে ছেলে পাঠিয়ে দিতেন কোন প্রয়োজন থাকলে।

১৯১৪ সাল, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে। সেই সময় একদিন

বিকেলে এস-ডি-ও'র ছেলেকে নিয়ে চাপরাসী দাদাঠাকুরের কাছে এসে জানালে যে, আজই একবার এস-ডি-ও'র সঙ্গে দেখা করার, জন্য, বিশেষ প্রয়োজন।

দাদাঠাকুর সাবান-সাজিমাটী দিয়ে হাতের কালি তুলে গামছা কাঁধে এস-ডি-ও'র বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চাপরাসী জানালে— এস-ডি-ও ওপরে গেছেন, এখনি নামবেন, বসতে বলেছেন। তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন দুটি মাত্র চেয়ার, দুজন বসে। একটি চেয়ারে স্থানীয় এক যুবক ডাক্তার, অপর চেয়ারটিতে নতুন এক মুন্সেফ। দেওয়ালের ধারে একটি বড় বেঞ্চি ছিল, দাদাঠাকুর সেটাতে বসলেন। মুন্সেফবাবুর নাম শ্রীঅপরা মুখোপাধ্যায়, দাদাঠাকুরকে তিনি চিনতেন না। আস্তে আস্তে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছন ফিরে রুষ্টভাবে প্রশ্ন করলেন —'বসলে যে?'

মুহূর্তের মধ্যে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাদাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—'বেঞ্চি আপনার? আমি এস-ডি-ও'র বেঞ্চি ভেবে বসেছিলাম।'

অপরাবাবু অপমানিত বোধ করলেন, ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— 'জানো আমি কে?'

দাদাঠাকুর—'জানি আপনি কে, আর কেন।'

অপরাবাবু—'কে আর কেন মানে?'

দাদাঠাকুর—'আপনি নতুন মুন্সেফ, বদলি হয়ে এখানে এসেছেন তাই জানি আপনি কে। আর যদি আপনার লালগোলা, কাশিম-বাজার অথবা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের মতো এস্টেট থাকতো তাহলে আজ জঙ্গীপুর, কাল ঢাকা তারপর চব্বিশ পরগণা ঘুরে ঘুরে চাকরি করতেন না। পেটের জ্বালায় চাকরি করেন, তাই জানি কেন।'

তখন অপরাবাবু দাদাঠাকুরের হাত দুখানি ধরে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—'ব্রাহ্মণ বোধ হয়?'

দাদাঠাকুর—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অপরাবাবু—'এমন তেজী ব্রাহ্মণ আমি দেখিনি। তাই 'তুমি' বলেছি, কিছু মনে ক'রো না, বয়সে কিছু বড় আমি। আমায় একটা কথা দিতে হবে তোমাকে, বলো কথা দেবে?'

দাদাঠাকুর তখনও বিরক্ত হয়েই আছেন, বললেন—'না শুনে কোন কথা দেবো না।'

অপরাবাবু—'ভাই, আমার একটি মেয়ে বিধবা, একাদশীতে নির্জলা উপোস করে, দ্বাদশীর দিন কোন ব্রাহ্মণকে জল পান না করিয়ে জল গ্রহণ করে না সে। তাই বলছিলাম—যদি তুমিই প্রতিটি দ্বাদশীর দিন সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে জল গ্রহণ করো তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি, এতে মেয়েটির সময়মতো খাওয়া হবে। কষ্টের লাঘব হবে তার।

কথাগুলো দাদাঠাকুরের কোমল হৃদয় স্পর্শ করলো। তিনি অপরাবাবুকে কথা দিলেন। অপরাবাবু বিশেষ আনন্দিত হলেন। তারপর থেকে প্রতিটি দ্বাদশীর দিনই খুব ভোরে দাদাঠাকুর অপরাবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। দাদাঠাকুর বলতেন—'প্রতি দ্বাদশীতেই ভোরে কাকও বেরুলো আর আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম—অপরাবাবুর মেয়ের দেওয়া জল খেতে, কারণ দেরি হলে মেয়েটার কষ্ট হবে। নীচতলা থেকেই অপরাবাবুর মেয়েটিকে ডাক দিতাম—'মা, তুটো বাতাসা এক ঘটি জল নিয়ে আয়।'

এরপর অপরাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমনই হলো যে, তিনি দাদাঠাকুরকে তুই বলেই সম্বোধন করতেন। দাদাঠাকুর এক সময় খবর পেলেন অপরাবাবু শূলবেদনায় (কলিক পেন) শয্যাশায়ী। দেখতে গেলেন দাদাঠাকুর। তিনি তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। দাদাঠাকুর তাঁর পাশে বসলেন। অপরাবাবু বললেন—'ভাই শরৎ, খুব কষ্ট হচ্ছে—অসহ্য যন্ত্রণা।'

দাদাঠাকুর বললেন—'আপনি ও রকম ক'রে কাতরাবেন না, আপনার চাপরাসীরা শূল বেদনার যন্ত্রণায় ঐ রকমভাবে কাতরায়।

আপনি হাকিম, আপনি বেহাগে, কিংবা মোহন সুরে ধরুন।' অপরাবাবু হেসে বললেন—'হাসলে বড়ো লাগছে ভাই। তোকে দেখতে আসতে হবে না, তুই বাড়ি যা।'

দাদাঠাকুরের ছাপাখানায় স্থানীয় স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপানো হতো। বিনয়কুমার সেই স্কুলেরই ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগে স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা হয়। বিনয়কুমার খুব সামান্য নম্বরের ব্যবধানে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। দাদাঠাকুরকে বিনয়কুমার সে কথা জানালে তিনি বলেন—'আমি দিয়েছি বই কিনে, স্কুলের মাইনে আর সব কিছু, পরীক্ষা নেবো আমি। স্কুলের ফলাফল আমার জানবার প্রয়োজন নেই। তুমি মন খারাপ করে শরীরপাত করবে না।'

এর ঠিক দু'দিন পরে একই নৌকো চেপে দাদাঠাকুর, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আরও কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোক গঙ্গা পার হচ্ছিলেন। হেসে প্রধান শিক্ষক দাদাঠাকুরকে বললেন—'পণ্ডিত মশাই, বিনয় টেস্ট এগজামিনে পাশ করতে পারেনি, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এ বছর দিতে পারবে না।'

দাদাঠাকুর—'তাহলে আমাকে সার্টিফিকেট দিন।'

প্রধান শিক্ষক—'কিসের সার্টিফিকেট ?'

দাদাঠাকুর—'আমার ছাপাখানায় প্রশ্নপত্র ছাপা হয়, আমার ছেলে প্রথম স্থান অধিকার না করে পাশই করতে পারে নি। তাহলে আমার সততা, আমার ছাপাখানার সুনাম আছে, সেই জন্যে সার্টিফিকেট চাই।'

প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য যাত্রীরা বিস্মিত হলেন এই কথায়। দাদাঠাকুর খবরে জেনেছেন যে, মহকুমা শাসকের ভ্রাতুষ্পুত্রও পাশ করেনি এবং বিনয়কুমারের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছে। দু'দিন পরে বিনয়কুমার দাদাঠাকুরকে জানালেন যে, গ্রেস নম্বর দিয়ে

কিছু ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই খবরে দাদাঠাকুর ক্রুদ্ধ হলেন এবং প্রধান শিক্ষক-মহাশয়কে কঠোরভাবে জানালেন যে, গ্রেস নম্বরে যদি বিনয়কে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তিনি ওপরওয়ালা—ডাইরেকটার অফ পাবলিক ইন্‌সট্রাকশানসকে জানাবেন এই অসৎ কাজের কথা। প্রধান শিক্ষক বিচলিত হয়ে ছুটলেন এস-ডি-ও সাহেবের কাছে। সব কথা জানালেন। এস-ডি-ও সাহেব ভীত হলেন, কারণ তিনি দাদাঠাকুরকে জানতেন। স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এস-ডি-ও স্বয়ং। প্রধান শিক্ষককে নিষেধ করলেন—গ্রেস নম্বর দিয়ে যেন পরীক্ষা দিতে দেওয়া না হয়।

একদিন কোন কাজে দাদাঠাকুরকে বহরমপুর যেতে হয়। স্টেশনে গিয়ে টিকিট বিক্রির জানলার সামনে ক্রেতাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়ালেন তিনি। দাদাঠাকুরের সামনেই জানলার মুখে একটি পনর-ষোল বছরের ছেলে দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে টিকিট কেনবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়ালো এক মধ্যবয়সী মহিলা। ছেলেটির হাতে আট আনা পয়সা দিয়ে মিষ্টি হেসে বললে—'বাছা, আমাকে একখানা টিকিট কিনে দে, পরের স্টেশনে যাবো।'

ছেলেটি নিজের জন্যে একখানি কলকাতার টিকিট কিনলো তার দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে—আর মহিলাটির জন্যে আধুলিটি ভাঙিয়ে একটি টিকিট আর বাকী পয়সা নিয়ে ফেরত দিল। মহিলাটি দশ টাকার নোট ছেলেটির হাতে আগেই দেখেছিল। সে বেশ চমকের সুরে বললে—'আমি দশ টাকার নোট দিলাম তোমাকে, আর তুমি এই ক'টা মাত্র পয়সা ফেরত দিচ্ছ!'

ছেলেটি সভয়ে বললে—'আপনি আমাকে তো একটা আধুলি

দিয়ে পরের স্টেশনের জন্যে একখানা টিকিট কিনে দিতে বললেন। দশ টাকার নোটটা তো আমার নিজের।'

তখন অভিনয় শুরু হলো। মহিলাটি বললে—'বাছা, অমন কাজ আর কোরো না—এই বয়সে এত !—যাক্, এখন আমার বাকী টাকা ক'টা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।'

ছেলেটি বিপন্ন হয়ে কাঁদতে লাগল। পেছন থেকে দাদাঠাকুর সমস্ত ঘটনাই দেখেছিলেন, আর স্থির থাকতে পারলেন না। বেশ জোরের সঙ্গেই প্রতিবাদ জানিয়ে মহিলাটিকে বললেন—'তুমি তো একটা আধুলি দিলে একখানা টিকিট কিনে দেবার জন্যে, আমি তো দেখেছি।'

মহিলাটি তখন দাদাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সেই আগের সুরেই বললো—'বাবা, আপনারও বয়েস হয়েছে, আপনি না দেখে না জেনে অমন কথা বলবেন না, আমি মিছে কথা বলিনি।'

গণ্ডগোল দেখে একজন রেলওয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ালো। মহিলাটির কথা, ছেলেটির কথা এবং দাদাঠাকুরের কথা—সব শুনে দয়াপরবশ হয়ে মহিলাটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—'আপনার কিছু ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেবো।' তারপর দাদাঠাকুরকে বললে—'আপনাকে আর এই ছেলেটিকে আমার সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে। ট্রেন এলে আমার সঙ্গে কামরায় উঠবেন।'

ছেলেটি তখন অঝোরে কাঁদছে দেখে দাদাঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'বাবা, তুই কাঁদিসনি, আমি তো সঙ্গে যাবো—তোর ভয় নেই।'

যথাসময়ে ট্রেন এলো। সেই ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে এক পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট নামলেন। দাদাঠাকুরকে দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন—'আজ আমার সৌভাগ্য দাদা, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—পায়ের ধুলো দিন।'

দাদাঠাকুর একটু তফাতে পেছিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন—

'এখন আমাকে স্পর্শ করবেন না, এখন আমি পুলিসের কাছে বন্দী হয়ে এই ট্রেনেই আদালতে যাচ্ছি, আমাদের বিচার হবে।'

পুলিস অফিসারটি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'বলেন কি। কি হয়েছে দাদা ?—খুলে বলুন।'

ইতিমধ্যে পুলিসটা সেলাম ঠুকে অফিসারটিকে ঘটনাটি জানালো। সেই অবসরে মহিলাটি পুলিস অফিসারের নজর এড়াতে মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অফিসারের নজরকে ফাঁকি দিতে পারলো না। তিনি প্রশ্ন করলেন—'জেল থেকে বেরিয়েই আবার সেই বদমায়েসি শুরু হয়ে গেছে!—ছোট এই ছেলেটাকে ঠকাচ্ছিস আর সেই সঙ্গে এই পূজনীয় মানুষটিকেও বিপাকে ফেলছিস?' তারপর রেলওয়ে পুলিসটিকে বললেন—'কেত্‌না রোজ পুলিসমে কাম্‌ কর্‌তা হ্যায় তুম্‌? এই দাগী বদ্‌মাস মাগীকো ফটো হর্‌ থানে মে হ্যায়, আউর উস্‌কো তুম্‌ পয়ছানা নেহি? তুমহারা নাম আউর নম্বর বাতাও।—বেকুব কাঁহাকা!'

পুলিসটি বেকুবের মতোই দাঁড়িয়ে থাকলো। অফিসারটি তখন তাকে নির্দেশ দিলেন মহিলাটিকে কোর্টে হাজির করার জন্যে এবং তিনি নিজে সেখানে না পৌঁছানো অবধি অপেক্ষা করতে। এরপর দাদাঠাকুরের পায়ের ধূলো নিয়ে অফিসারটি বললেন—'দাদা, এই সময়ে আমি এসে না পড়লে আপনি খুব হয়রান হতেন। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন যান, ছেলেটিকেও সঙ্গে নিন।

একবার এক স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে স্কুলের পরিচালকগণ দাদাঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ইনস্‌পেক্টর অফ স্কুলস্‌। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ছেলেদের উদ্দেশ্যে দাদাঠাকুর তাঁর ভাষণে বলেন—'বাবা, তোমরা সুশিক্ষা লাভ করে খাঁটী মানুষ হও।

পরনির্ভরশীল হয়ো না। আজ তোমরা সকলেই দেখেছ সভাপতি মহাশয় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এসেছেন। তোমরা যেন গভর্নড্ বাই দি প্রি-পোজিশন কোচ্ম্যান্ হয়ো না। নিজের পায়ের ওপর, নিজের মনের ওপর নির্ভর করে চলবে।'

স্কুল ইনস্পেক্টর দাদাঠাকুরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। দাদাঠাকুরের কথাগুলি শুনে হেসে বললেন—'পণ্ডিত মশাই, ছেলেদের ভুল শেখাবেন না, ঘোড়ার গাড়ির কোচ্ম্যান প্রি-পোজিশন নয়।'

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করেই সহাস্য উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'গাড়ির আরোহী গাড়ির ভিতরেই বসেন, কোচ্ম্যান গাড়ির আগে বসে গাড়ি চালনা করেন, তাই—প্রি-পোজিশন।'

স্কুল ইনস্পেক্টর দাদাঠাকুরের ক্ষিপ্র উত্তরে হাততালি দিতে দিতে বললেন, 'পণ্ডিত মশাই, অদ্ভুত আপনার ব্যাখ্যা, This is a real পণ্ডিত মহাশয়!'

সেখানে বয়স্কাউটরাও উপস্থিত ছিল। তারা সবাই ছাত্র। তাদেরকেও দাদাঠাকুর কিছু বললেন। বয়স্কাউটরা প্রতিজ্ঞা করে পরের সেবা আর উপকার করার ব্রত নিয়ে। তাদের মাঝে মাঝে সম্মেলন হয় এবং সেই সম্মেলনে প্রত্যেককেই জানাতে হয় কে কি ভালো কাজ করেছে সেদিন। এই রকমই এক সম্মেলনের কথা তুলে দাদাঠাকুর তাঁর ভাষণে বললেন—এই রকম একদিন একটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হলো, সে কি ভালো কাজ করেছে সেদিন। ছেলেটি জানালো—'স্যার, আজ একজন অন্ধ মানুষকে রাস্তা পার করে দিয়েছি, সে সময়ে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার প্রচুর ভিড় ছিল।' আর একজনকে প্রশ্ন করা হলে জবাবে সে বলে—'স্যার, একটি খোঁড়া মেয়েকে রাস্তা পার করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি।' আরও একজনকে প্রশ্ন করতে সে জানালে—'আজ ভোর বেলাতে আমাদের পুরোহিতমহাশয়কে ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছি, স্যার।' তখন তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো—কিভাবে সে পুরোহিতটিকে ট্রেন

ধরিয়ে দিয়েছে।—ছেলেটি বললো—'স্যার, আজ ভোরে আমি আমাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। দেখতে পেলাম পুরোহিত-মহাশয় আমাদেরই বাড়ির সামনে মাঠের উপর দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন স্টেশনের দিকে। হাত তুলে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠাকুরমশাই, এমন তাড়াতাড়ি হেঁটে কোথায় যাচ্ছেন—এত সকালে? ঠাকুরমশাই দাঁড়ালেন না, চলতে চলতেই বললেন—ট্রেন ধরতে স্টেশনে যাচ্ছি, দেরি হয়ে গেছে তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছি।—স্যার, আমি দেখলাম যে, সময় আর বেশি নেই, রেলের বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম, এখন ছুটে না গেলে ঠাকুরমশাই আর ট্রেনটি ধরতে পারবেন না।—আমার বাবা একটা নেড়ি-কুকুর পুষেছিলেন। কুকুরটার গলায় কাপড়ের পাড় দিয়ে বাঁধা ছিল জানলার গরাদে। তাড়াতাড়ি খুলে লু-লু করে লেলিয়ে দিলাম কুকুরটাকে। কুকুর ছুটলো পেছনে পেছনে, আর ঠাকুরমশাই কুকুরের তাড়ার চোটে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন ট্রেন ধরতে।

'স্টেশনের কাছেই মাঠের ধারে ছিল তারের বেড়া। সেই বেড়া টপকে স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করলেন ঠাকুরমশাই। আর ঠিক সেই সময়েই ট্রেনটি এসে দাঁড়ালো। দৌড়ে না গেলে কিছুতেই স্যার ট্রেনটা আর ধরতে পারতেন না তিনি!'

এই মহৎ উপকারের কথা শুনে বয়স্কাউট এবং উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা খুব আনন্দলাভ করলেন।—হাসির ধূম পড়ে গিয়েছিল।

একদিন সকলবেলায় বাড়ির দাওয়ায় বসে দাদাঠাকুর খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় দিদিঠাকরুণ এসে জানালেন—ঘরে চাল বাড়ন্ত! দাদাঠাকুর নিরুত্তর। তারপর স্নান করে নিয়মমতো আসনে বসে দিদিঠাকরুণকে বললেন—'আমি দাওয়ায় বসে তিনজন

ভিখারী বিদায় করেছি, তাদের চাল বেঁচেছে—ঐ তিন মুঠোতেই আমার ভাত হয়ে যাবে।'

আর একদিন দিদিঠাকরুণ চাল বাড়ন্ত জানালে দাদাঠাকুর বলেন—'আমার অবর্তমানে তোমরা কিভাবে সংসার চালাবে—আমি দেখে যেতে চাই, রিহার্সাল দাও।'

জীবনের সুখ-দুঃখ প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্রকে বলেছিলেন—'মা, সুখ-দুঃখ কখন আসে আর কিভাবে যে যায় তাই ভাবি।—একদিন সকালে দাওয়ায় বসে লেখা-পড়ায় ব্যস্ত, এমন সময় বড় বৌমা এসে কেঁদে জানালে তার খোকা জলের মতো পায়খানা করেছে সাতবার, ঝিমিয়ে পড়েছে। শুনেই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন, যাবার সময় চুপি চুপি বলে গেলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটির প্রস্রাব হলে তাঁকে জানাতে এবং না হলেও খবর পাঠাতে।

'লেখাপড়া বন্ধ করে ওষুধ খাইয়ে মনে মনে বেশ অশান্তি ভোগ করছি আর সময় গুণছি। আধঘণ্টার পূর্বেই বড় বৌমা এসে হাসিমুখে জানালে তার খোকা প্রস্রাব করেছে। শুনেই চললাম ডাক্তারবাড়ি। খবর শুনে ডাক্তার হেসে জানালেন—বিপদ কেটে গেছে, দুশ্চিন্তার আর কিছু নেই। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।—তাই ভাবি, একটি ছোট শিশুর মলমূত্র ত্যাগের ওপর আমার শান্তি-অশান্তি নির্ভর করছে।'

দাদাঠাকুরের স্বদেশী মনোভাবের পরিচয় অনেকেরই জানা ছিল। মাঝে মাঝেই গোয়েন্দা-পুলিস চেষ্টা করতো তাঁকে বিপাকে ফেলতে। তাদের মতলব তীক্ষ্ণবুদ্ধি দাদাঠাকুরের বুঝতে দেরি হতো না। প্রতিদিনই দু'তিনবার করে ছাপাখানার চারধার ভালো করে দেখতেন তিনি—যদি কোনোকিছু আপত্তিকর দ্রব্য কেউ কোথাও গুঁজে রেখে গিয়ে থাকে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ছাপাখানায় বসে কাজ করছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক প্রণাম জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করে জানালেন—'ছাপাবার প্রয়োজনে এসেছি। কি রকম খরচ পড়বে জানতে চাই।' এই বলে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজের নমুনাটি দাদাঠাকুরকে দেখালেন।

দাদাঠাকুর ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছিলেন—ভদ্রলোকটি বেশ হেসে হেসে কথা বললেও মাঝে মাঝে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন তিনি ঘরের সবকিছুর উপরে, এমন কি জানলা-দরজার আশপাশেও। দাদাঠাকুরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে কিছুই চাপা থাকলো না—সময় নষ্ট না করে দাদাঠাকুর বললেন—'আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল, ঘর বন্ধ করবো ; কালকে আসবেন।' জানলা বন্ধ করতে শুরু করলেন। ভদ্রলোকটি অগত্যা উঠে বললেন—'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি, কালকে আসবো।'

দাদাঠাকুর তখনকার মতো ছাপাখানা বন্ধ করে বাড়ি চলে এলেন। এবং রাতের আহারাদি শেষে তিনি আবার ছাপাখানায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে বসলেন। যেখানটিতে সন্ধ্যার সময় আসা ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তার পিছনদিকের জানলার পাশে অনেক পুরোনো কাগজপত্র জমা করা ছিল। সেই সকল কাগজপত্র সরিয়ে দাদাঠাকুর দেখলেন সেখানে একটা রিভলভার এবং কিছু কার্তুজ রয়েছে। মুহূর্তে তিনি সব বুঝতে পেরে বড় একখানা কাগজে সেগুলিকে জড়িয়ে ছাপাখানায় চাবি লাগিয়ে বাইরের চারধার ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। এরপর কাগজের সেই মোড়কটিকে সন্তর্পণে নিকটের গঙ্গায় নিক্ষেপ করে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরেও কিছু চিন্তা মাথায় রয়ে গেল তাঁর।

পরদিন সকালে গতকালের সেই ভদ্রলোকটি এসে হাসিমুখে ছাপাখানায় প্রবেশ করলেন। দাদাঠাকুর যথারীতি বসতে বললেন

তাঁকে। ভদ্রলোকটি বসতে বসতেই তাঁর কার্যসিদ্ধির আশায় জানলার পাশে ঘন ঘন নজর ফেলতে লাগলেন—সব ঠিকমতো আছে কিনা। ইতিমধ্যে দাদাঠাকুরের নজরও লোকটির আচরণের উপর নিবদ্ধ ছিল। দাদাঠাকুর একটু হেসে বিনীতভাবে জানালেন—'নতুন কাজ এখন আর নেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ বহু কাজ জমে রয়েছে।' উদ্দেশ্য—ভদ্রভাবে ভদ্রলোকটিকে বরাবরের জন্য দূরে সরিয়ে দেওয়া। বাধ্য হয়ে লোকটি উঠে পড়লেন, কিন্তু যাবার আগে সেই জানলাটির কাছে কি যেন খুঁজছেন মনে হল। দাদাঠাকুর বেশ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কিছু কি পড়ে গেছে নাকি আপনার?'

একটু চিন্তা করে লোকটি বললেন—'না, কিছু পড়েনি।—আচ্ছা, চলি।' নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। রিভলবারের কথা উচ্চারণও করতে পারলেন না তিনি।

নলিনীকান্ত সরকার এক সময় কিছুকালের জন্যে দাদাঠাকুরের প্রেসে আস্তানা নিয়েছিলেন। তখনকার বিপ্লবী দলের সঙ্গে নলিনী-বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং দাদাঠাকুর সে-কথা জানতেন। একদিন থানায় ডাক পড়লো তাঁর। উপস্থিত হলে ইন্‌সপেক্‌টার প্রভাতচন্দ্র দত্ত (দাদাঠাকুরের প্রভাতদা) তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে আগত দু'জন গোয়েন্দা অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। গোয়েন্দা অফিসার দু'জনে নলিনীকান্ত সরকারের রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে নানান রকম প্রশ্ন করলেন দাদাঠাকুরকে। সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক জবাব দিলেন তিনি, কিন্তু ওঁদের ইঙ্গিত এড়িয়ে গেলেন। যেমন—গোয়েন্দা অফিসার প্রশ্ন করলেন—'নলিনীকান্ত সরকার আপনার প্রেসে কাজ করেন, কেমন লোক তিনি?' দাদা-ঠাকুরের পাল্‌টা প্রশ্ন—'খারাপ লোক জেনে কেউ তাকে কাছে রেখে কাজ দেয়?' গোয়েন্দা অফিসার—'স্বদেশী কিনা, জানেন?' দাদাঠাকুর—'স্বদেশীই তো। একই মহকুমায় আমাদের বাড়ি—

আমার রঘুনাথগঞ্জ, ওর নিমতিতা'। দাদাঠাকুর প্রশ্নের উত্তর এই-ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে গোয়েন্দা অফিসার বললেন—'আপনি দেখছি সব প্রশ্নেরই কায়দা করে উত্তর দিচ্ছেন!' তখন দাদাঠাকুর গুরুগম্ভীর স্বরে গোয়েন্দা অফিসারকে বললেন—'সব খবরই যদি আমি দেবো তাহলে সরকার আপনাকে রেখেছেন কেন?' অফিসারটি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—'আচ্ছা, আপনি যান।'

দাদাঠাকুরের প্রভাতদা'ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মাঝে মাঝে সাক্ষ্যদান করার জন্য দাদাঠাকুরকে আদালতে যেতে হতো। কারণ যখনই বিপন্ন কোন মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে ন্যায়বিচারের আশায়, তিনি দ্বিধা না করে তখনই তার জন্য ছুটতেন নিজের সব কাজ দূরে ঠেলে। দাদাঠাকুরকে আদালতে পেলে সেখানকার প্রায় সকলেই বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠতেন—সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে হাকিম, উকিল, পিওন, পেয়াদা—সবাই।

একবার আদালতে সাক্ষ্যদানকালে হঠাৎ হাকিমবাবুর কিছু রসোপভোগের ইচ্ছা হয়। তিনি দাদাঠাকুরকে সরাসরি প্রশ্ন করেন—'আপনার অবস্থা কি রকম?'

দাদঠাকুর—'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অবস্থা মানুষের চার রকমের হয়ে থাকে—শারীরিক, মানসিক পারিবারিক আর আর্থিক—আপনি এর মধ্যে কোন্‌টি জানতে চাইছেন?'

হাকিম—'আপনার মানসিক অবস্থার কথা জানতে চাইছি—এবং আশা করছি ওর মধ্যেই সব অবস্থার কথা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জানা যাবে।'

দাদাঠাকুর—'আমার অবস্থার কথা বলতে গেলে কোন একজনের সঙ্গে তুলনা করেই বলতে হয়—ভালো কি মন্দ।—তা আমি কার সঙ্গে আমার তুলনা করবো—আপনার সঙ্গে, না উকিলবাবুর সঙ্গে?'

আদালতে তখন খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ দাদাঠাকুর এবারে কিছু বলবেন।

হাকিম—'আপনি উকিলবাবুর সঙ্গে আপনার তুলনা করুন।'

দাদাঠাকুর—'খুব ভোরে উঠে আমি নিজের বাগানে বেড়িয়ে আসি। সকাল সাতটায় জলযোগ সেরে রাস্তার ধারের দাওয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ি।—রোজই দেখি উকিলবাবু ঝোলা হাতে বাজারের দিকে বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে মক্কেলদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা নিয়ে আলোচনা করেন। ন'টার মধ্যে স্নান-আহারের তাগাদা দেয় ঘড়ি। মনে হয় যেন ঘড়িই উকিলবাবুর মনিব। তারপর স্নান সেরে আহারে বসে যে ভাত হাতে সয় না, সেই ভাত তাড়াতাড়ি খেয়ে তিনি মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে সাজপোশাক পরে বগলে কাগজপত্র নিয়ে আর গলায় দড়ি—যাকে আপনাদের ভাষায় নেকটাই বলা হয়, তাই বাঁধতে বাঁধতে আদালতের উদ্দেশে পড়ি-কি-মরি করে ছোটেন। আমি তখন মাদুর বিছিয়ে বালিশ মাথায় দিয়ে বিশ্রাম করি আর তাঁর ছোটাছুটি দেখি। মনে বড় দুঃখ হয় এই দেখে।—তাই বলি, আমার ঘড়িও নেই, তাই মনিবও নেই।'

দাদাঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন একজন যুবক উকিল একবার দাদাঠাকুরের শৈশবের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু রায়বাহাদুর কিরীটিভূষণ দাস এম. এল. এ-র আদালতে দাদাঠাকুরকে জেরা করার সময় প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে আপনার বয়স কত ছিল? এত সব কথা আপনি জানলেন কি করে?'

দাদাঠাকুর—'কাকার কাছে শুনেছিলাম, আমার বয়স তখন প্রায় বারো-তের বছর।'

উকিলবাবু—'আপনার কত ছোটবেলাকার কথা মনে আছে?'

দাদাঠাকুর—'আমার অ আ ক খ সবই মনে রয়েছে।'

আদালতে হাসির রোল পড়ে গেল।

উদারপ্রাণ দাদাঠাকুরের স্নেহের এক দরিদ্র বন্ধু মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন—'আমার ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে, আমি বাঁচবো না, ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা তুমিই কোরো।' বন্ধুটির মৃত্যুর পর তাঁর সেই রোগগ্রস্ত ছেলেটিকে দাদাঠাকুর দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লীর যক্ষ্মা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কথা দিলে তা তিনি পালন করতেন নিজের অর্থ ব্যয় করেও।

চাঁদপুরে একবার কুলী ধর্মঘট হয়। নিরীহ কুলীদের ওপর গুলি বর্ষণের হুকুম দিয়েছিলেন তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার কে. সি. দে, আই-সি-এস এবং সেই হুকুম পালন করেছিলেন তদানীন্তন জেলাশাসক সুশীলকুমার সিংহ, আই-সি-এস। ইনি লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্র।

কুলীদের উপর গুলি বর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছুটলেন চাঁদপুরে কুলীদের পক্ষ নিলেন তিনি। মামলাও হলো।

এদিকে দাদাঠাকুর 'মোহ-মুদ্গরের' অনুকরণে কবিতায় 'কুলী-মুদ্গর' রচনা করে ছাপিয়ে বিক্রি শুরু করলেন। একখানি পুস্তিকা রসিক মিল্‌নী সাহেবের হাতে পড়ে। আই.-সি.-এস মিল্‌নী সাহেব জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা ভালোই জানতেন এবং একখানি বাংলা-ইংরাজি অভিধানও লিখেছিলেন তিনি। দাদাঠাকুরের কুলী-মুদ্গর পুস্তিকাটি

বেশ মনোযোগ সহকারেই পড়েছিলেন সাহেব।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পথে দাদাঠাকুরকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে বাংলায় ডাক দিলেন সাহেব—'পণ্ডিত, আমি 'কুলী-মুদ্গর' পড়েছি, বড়ো ভালো লাগলো। কাকে কাকে ভৎর্সনা করেছেন তা-ও বুঝেছি।'

বীরভূমের সিউড়ি শহরে বাংলার লাটসাহেব লর্ড রোনাল্ডসে আসছেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করে তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এস এবং জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস দু'জনে দু'খানি তারবার্তা পাঠিয়ে দাদাঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানান—লাটসাহেবকে কিছু রঙ্গ-কৌতুক দ্বারা আনন্দ দান করবার জন্য। তারবার্তা দু'টিতেই ছিল—Please come to entertain His Excellency.

তারবার্তা দু'টি পেয়ে দাদাঠাকুর সিউড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর গুরুসদয় খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু দু'জনেই অদ্ভুত এক প্রস্তাব করলেন, বললেন—'পণ্ডিত মশাই, আপনার জন্যে একজোড়া চটি জুতো আর জামা আনিয়েছি। আপনি লাটসাহেবের সামনে জামা-জুতো পরে উপস্থিত হবেন। অবশ্য সভা ভেঙে গেলে আপনি জামা-জুতো ফেলে দেবেন।—আপনার কাছে আমাদের এই অনুরোধ।'

খুবই বিরক্ত বোধ করলেন দাদাঠাকুর এই অবান্তর প্রস্তাবে। বিরক্তির সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন করলেন—'আমাকে তার পাঠিয়েছেন আপনারা এখানে আসবার জন্যে। আপনাদের কি লাটসাহেবের সামনে আমাকে ভদ্রবেশে জামা-জুতো পরিয়ে উপস্থিত করার ইচ্ছা? —তাহলে ভুল করেছেন, আমি যা নই, তা সাজতে পারবো না। আমাকে ট্রেনের ভাড়া দিয়ে দিন, ফিরে যাবো।'

ওঁদের ঠিক কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুর্‌লে আই.-সি-এস। বাংলা জানতেন তিনি। সব কথাই তাঁর কানে গেছে। তিনি এবার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—'কি হয়েছে?'

মিঃ গুর্‌লেকে দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন—'Mr. Goorly, please ask His Excellency to remove distress and poverty from His Excellency's Province, then everybody will be gentleman like Mr. Goopta, Mr. Dutt and others.'

দাদাঠাকুর বলতেন—'ভাই, সাহেব আমার সব কথা শুনে বললে—'Just a few minutes, I am comming'. গুর্‌লে সোজা গিয়ে লাটসাহেবকে জানিয়েছে—'A gentleman has come from Jangipore in rural dress to entertain Your Excellency.'

'লাটসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন—'Bring him here.'

পরমুহূর্তেই গুর্‌লে সাহেব এসে দাদাঠাকুরকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। মিঃ গুপ্ত ও মিঃ দত্ত দাদাঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে প্রবেশ করলেন।

যথাসময়ে দাদাঠাকুরের নাম ডাকা হলো। উঠে দাঁড়িয়ে দাদাঠাকুর নিজের পরিচয় দিলেন—ইংরাজী কবিতায়, মুখে মুখে রচনা করেই। বললেন:

আই অ্যাম্ কামিং ফ্রম্ মুর্শিদাবাদ
বাট্ নট ফ্রম্ বার্‌হাম্‌পোর,—
হ্যাড্ আই কাম্ ফ্রম্ দ্যাট ভেরি প্লেস
অল্ মাইট্ হ্যাভ্ শাট্ আপ দি ডোর।
দে মাইট্ হ্যাভ্ থট্ দ্যাট্ আই হ্যাভ্ কাম্
ফ্রম্ দি ফেমাস্ অ্যাসাইলাম্।
মাই অ্যাবোড্ ইজ্ অ্যাট সাচ্ এ প্লেস
হুইচ ইজ নাউ ইন্ ফুল ডিস্ট্রেস।

এ রিভার ক্লোজ্ স্ট্যাগন্যাণ্ট স্ট্রীম
ফর্ দি এক্সপেরিমেণ্ট অব ড্রেনেজ স্কীম,
ইওর এক্সেলেন্সি ইজ্ স্পেণ্ডিং মাচ্
টু কীপ আস্ অ্যালাইভ উইথ লাভিং টাচ্।
আই থিঙ্ক, আই উইল হ্যাভ্ টু সো নো মোর
দ্যাট আই অ্যাম্ কামিং ফ্রম্…

দাদাঠাকুরের কথা শেষ হতে না হতেই লাটসাহেব নিজেই করতালি দিয়ে কবিতাটি শেষ করলেন—'জাঙ্গিপুর'—। দাদাঠাকুর বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে 'ফ্রম্' উচ্চারণ করেই থেমেছিলাম, লাট-সাহেবের মুখ দিয়ে 'জঙ্গিপুর' শব্দটি বের করে তখনকার মতো আমার কবিতাটির সমাপ্তি ঘটাবার আশায়।'

আত্মপরিচয়ের পর এবার দাদাঠাকুর সেলাম জানালেন লাট-সাহেবকে—মুখে মুখে কবিতা রচনার দ্বারা। বললেন :

দি ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাজ ইণ্ডেন্টেড্ মি
টু এন্টারটেন ইওর এক্সেলেন্সি।
আই অ্যাম্ সিক্‌লি রুর‍্যাল ম্যান,
লেট মি ট্রাই নাও হোয়াট আই ক্যান।

এরপর হিন্দীতে দাদাঠাকুর একের পর এক সেলাম নিবেদন শুরু করলেন :

পহেলা সেলাম পঁহ্‌ছে বেলাত্
এম্পেরর কা ক্রাউনমে,
দুস্‌রা সেলাম লাটসাহেবকো
বীরভূম সিউড়ি টাউন্‌মে,
তিসরা সেলাম হাকিম লোগ ঔর
উকিল বাবুকা গাউনমে।
ঔর এক সেলাম পঁহ্‌ছে সব কোই
ভদ্দরলোকগা ডেরা মে।

ঔর এক সেলাম পঁহ্‌ছে মেরা

মোক্তার লোকগা জেরা মে ॥

ঔর এক সেলাম পঁহ্‌ছে সব

আমলা লোগোকা জুতামে

ঔর এক সেলাম পঁহ্‌ছে সব কোই

চাপরাসীকা গুঁতা মে ॥

ঔর এক সেলাম বহুৎ কায়দা সে

লীজে মেরা পেট।

জিসকা বাস্‌তে শরম ছোড় দিয়া

ছোড় দিয়া এটিকেট্‌ ॥

দাদাঠাকুর এরপরে কয়েকটি ব্যঙ্গ-কৌতুকাভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। সব শেষে দাদাঠাকুর পুলিসী-শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। এ বিষয়ে প্রথমেই বললেন—'শিক্ষানবীশদের 'পুলিস-মেকিং ফ্যাকটরী'তে গোড়াতেই শেখানো হয় 'রাইট্‌ লেফ্‌ট্‌, রাইট্‌ লেফ্‌ট্‌ —অলওয়েজ বার্গলারী, অলওয়েজ থেফ্‌ট্‌' ইত্যাদি। সেই কারণেই 'রাই্‌ট্‌ থিঙ্কস্‌ আর অলওয়েজ লেফ্‌ট্‌ বাই দেম্‌।' পুলিসের অনেক রকম অন্যায় কাজের ঘোরতর চিত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে লাটসাহেবের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। সেখানে ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল অব পুলিসও উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যঙ্গ-কৌতুকাভিনয় আই. জি. সাহেবের অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তাই মাঝে মাঝে দাদাঠাকুরের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন তিনি। কিন্তু নির্ভীক দাদাঠাকুর বুঝতে পারলেও আই. জি. সাহেবের বিরক্তিযুক্ত কটাক্ষপাতকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, হর্ষধ্বনির মধ্যেই শেষে আসন গ্রহণ করলেন তিনি।

গুর্‌লে সাহেব অভিভূত হয়েছিলেন দাদাঠাকুরের এই অদ্ভুত রচনাশক্তি আর ব্যঙ্গ-কৌতুকের নিদর্শন পেয়ে। তাই চুপি চুপি তিনি দাদাঠাকুরকে জানালেন—'His Excellency wants to give you a certificate.'

দাদাঠাকুর—'What shall I do with the certificate ; I do'nt need it. '

মিঃ গুর্‌লে—'People desire certificates from His Excelleney but you do'nt need it ?'

দাদাঠাকুর—'Certificate is always for the past. Will the certificate help me in future ? If I murder anybody or rob anybody and produce the certificate will it help me.'

মিঃ গুর্‌লে হেসে জবাব দিলেন—'That can never be.'

দাদাঠাকুর—'Then the certificate has no value to me.'

সভাভঙ্গের পর মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মিঃ গুরুসদয় দত্ত এগিয়ে এসে দাদাঠাকুরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—'আজ আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনার জন্যেই এমন সুন্দর সফলতা লাভ করলো, এর জন্যে কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।'

দাদাঠাকুর—'আগে যদি জানতাম এখানে এত 'গু' তাহলে কিছুতেই আসতাম না। গুপ্ত, গুরুসদয়, গুর্‌লে—এত 'গু' এখানে !'

সকলেই নিরুত্তর। কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি দাদাঠাকুরের এই মন্তব্যের।

নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সাহিত্যরসিক মানুষ। কবিতা লিখতেন। মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। দাদাঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মহারাজা বিশেষ আনন্দিত হলেন এবং ক্রমশঃ তিনি তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। আলাপ প্রসঙ্গে জানলেন দাদাঠাকুর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তাছাড়া রাণী ভবানীর ব্রহ্মোত্তর ধান জমিও

কিছু আছে দাদাঠাকুরের, যা তিনি পৈতৃকসূত্রে ভোগ করছেন।

কথায় কথায় মহারাজা একদিন বললেন—'শরৎ আমি আর 'আপনি' বলবো না, এবার থেকে 'তুমি' বলবো। আর তুমি আমাকে 'তুমি'ই বলবে—আর দাদাও বলবে। কারণ আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ। কখনও মহারাজা বলবে না, তুমি আমার প্রজা নও, ছোট তরফের প্রজা।'

এক বিবাহ উপলক্ষ্যে জগদীন্দ্রনাথ একবার দাদাঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন নাটোরে যাবার জন্য। দাদাঠাকুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাটোরে গিয়েছিলেন।

মহারাজা যথারীতি আপ্যায়নের পর দাদাঠাকুরকে নাটোরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দেখাবার জন্য একজন লোক দিলেন। লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে দাদাঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন। সব দেখে-শুনে কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। মহারাজা প্রশ্ন করলেন—'শরৎ, নাটোর কেমন দেখলি ?'

দাদাঠাকুর—'মহারাজ, দেখে এলাম নেগেটিভে পজেটিভ।'

মহারাজা—'নেগেটিভে পজেটিভ মানে ?'

দাদাঠাকুর—'যেমন নাবালক—আসলে সে বালক, রাজপুতানা—রাজপুতেরই দেশ, বেদানা—সেটি দানায় পূর্ণ—সেই রকমই এখানেও স্বয়ং মহারাজা থেকে সামান্য প্রজা পর্যন্ত টোর হয়ে আছে—নাম হল নাটোর !'

মহারাজা—'তোকে আর নেগেটিভে পজেটিভ বোঝাতে হবে না ভাই, কাছাকাছি ছেলেপুলেরা সব রয়েছে, তাদের কানে যাবে—তারাও পজেটিভে পূর্ণ হয়ে যাবে।'

দুপুরে নিমন্ত্রিত অতিথিরা একসঙ্গে আহারে বসেছেন। মহারাজা নিজে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের দেখাশোনা করছেন কার কি প্রয়োজন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে দাদাঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা প্রতি মুহূর্তেই দাদাঠাকুরকে খুঁচিয়ে কিছু রস উপভোগ করা।

মহারাজা দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন—'কি রকম করে খাচ্ছিস? ভাতে ঘি মেখে বড়ি ভাজা দিয়ে প্রথমে খেতে হয়, পরে শুক্তো, ডাল, তরকারি, মাছ ইত্যাদি খাবার পর চাটনি দই মিষ্টান্ন খাওয়াই রীতি—আর তুই প্রথমেই মাছ দিয়ে খেতে শুরু করলি?'

দাদাঠাকুর—'আপনার এস্টেটের নিয়ম আর আমার এস্টেটের নিয়ম যে আলাদা। আপনার গোলাভরা ধান-চাল থাকে আর তার ওপরে ইঁদুর-বেরালে উৎপাত করে, ময়লা ছড়ায়; আপনি সেই ভাত খান। কাজেই তাকে গাওয়া ঘিয়ে সুবাসিত করতে হয়। আমার এস্টেটে ওই প্রথা অচল। আমার এস্টেটের নিয়ম ফ্রেস পয়সা, ফ্রেস চাল, বাসী-পুরোনো কিছুই থাকবে না।'

আহারের পর হাত-মুখ ধুতে গেলেন সকলে। মহারাজার সু-বন্দোবস্ত—বহু ভৃত্য রূপোর গাড়ুতে জল, হাতে সাবান আর তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি অতিথি হাত-মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুচ্ছেন। এদিকে মহারাজা দাদাঠাকুরকে সেখানে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখেন দাদাঠাকুর হাতে মাটি মেখে পুকুরের জলে হাত ধুচ্ছেন। তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা শরৎ, ওখানে অত লোকজন জল-সাবান-তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আর তুই পুকুরে এসে মাটি মাখছিস!'

দাদাঠাকুর—'জবাব এখানেই দেবো, না সকলের সামনে দিলেই ভালো হবে?'

মহারাজা—'সকলের সামনেই তাহলে তোর জবাব শুনবো।'

দাদাঠাকুর প্রাসাদে এলেন। মহারাজা উপস্থিত অতিথিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনাদের হাত-মুখ ধোবার জন্যে গাড়ুতে জল, হাতে সাবান তোয়ালে নিয়ে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা হাত-মুখ ধুলেন। আর শরৎ পুকুরে গিয়ে হাতে মাটি মেখে পুকুরের জলে মুখ-হাত ধুয়ে এলো, পাড়াগেঁয়ে মানুষ কিনা, তাই এই বুদ্ধি!'

দাদাঠাকুর—'রাজবাড়ির পুরোনো হিসেবের খাতাপত্র দপ্তরেই

রয়েছে, সেই সব খাতাপত্রেই লেখা আছে একটা রূপোর গাড়ু তৈরি করতে কত টাকা লেগেছিল আর রাজবাড়ির পুকুরটা কাটিয়ে তৈরি করতে কত লোকজন খেটেছিল এবং খরচ কত পড়েছিল। আমি অল্প . দামের জিনিস ব্যবহার করতে পারি না—যদিও এটা আমার বদ-অভ্যাস। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন—কে 'বনেদী'।' একথা শুনে সমবেত অতিথিবৃন্দ বেশ আনন্দ পেলেন।

এরপর মহারাজা গোপনে প্রশ্ন করলেন—'শরৎ, 'আছে'-র গরম অনেক দেখেছি। রাণী ভবানীকে লোকে অর্ধ বঙ্গেশ্বরী বলতো, আমি সেই নাটোরেরই মহারাজা, কাজেই আমারও কিছু 'গরম' আছে। কোচবিহারের মহারাজা তাঁর 'গরম' দেখিয়ে আমাকে বলে —'চুপ্ রহো', কোচবিহারকে জয়পুরের মহারাজা 'গরম' দেখিয়ে বলে 'চুপ্ রহো'—জয়পুরের মহারাজাকে হায়দ্রাবাদের নিজাম 'গরম' দেখিয়ে বলে—'চুপ্ রহো', ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ হায়দ্রাবাদের নিজামকে 'গরম' দেখিয়ে বলে—'চুপ্ রহো', অথচ তোর কিছুই নেই বলিস কিন্তু তোর 'গরম' তো দেখছি সকলের চেয়ে বেশী! 'নাই'এর এত 'গরম' কি করে হয়?'

দাদাঠাকুর—'আঁতুড়ঘরে ধাই-মা 'নাই' কেটে দিলে সেই থেকেই 'নাই'-এর গরম আজও আছে।'

একদিন মহারাজা অফিসে বসে মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার কাজ দেখছেন এমন সময় অফিসের সামনে দিয়ে দাদাঠাকুর 'বিদূষক' ফিরি করতে করতে চলেছেন। সেদিন দুপুরবেলায় বৃষ্টিও হচ্ছিল। বৃষ্টি থেকে 'বিদূষক'গুলো বাঁচাবার জন্য ছাতার আড়াল করেছিলেন, ফলে নিজের গায়ের চাদরখানির কিছু অংশ ভিজেছিল তাঁর।

মহারাজা দাদাঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনে সহ-সম্পাদক ফকিরচাঁদ-বাবুকে বললেন—'শরৎ যাচ্ছে বোধহয়, ডাকো।'

ফকিরবাবু রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দেখলেন দাদাঠাকুর 'বিদূষক' নিয়ে হেঁকে চলেছেন। ফকিরবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন—'মহারাজা আপনাকে ডাকছেন।'

দাদাঠাকুর নারাজ—'এখন যাবো না, আমার তাড়া আছে।'

ইতিমধ্যে মহারাজা নিজে এসে বারন্দায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ডাকলেন—'শরৎ, একবার আয় ভাই।'

মহারাজার অনুরোধ এড়াতে না পেরে দাদাঠাকুর শেষ পর্যন্ত পত্রিকা অফিসে এলেন। মহারাজা আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'শরৎ, তুই কত কষ্ট করছিস ভাই, তবে তোর আর আমার স্ট্যাটাস এক। আমি একটা কাগজের এডিটর আর তুইও আর একটা কাগজের এডিটর।'

দাদাঠাকুর—'তা ঠিক, তবে মহারাজ, আমি কলকাতার প্রায় সব কাগজের আপিসেই যাই, কিন্তু 'মানসী ও মর্মবাণী'র আপিসে এলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।'

মহারাজা—'সেটা তুই আমাদেরকে ভালোবাসিস বলে।'

দাদাঠাকুর—'মহারাজ, ভালোবাসাবাসির জন্যে নয়। এমনটি কোথাও আর দেখিনি আমি, মহারাজা এডিটর—ফকির জয়েন্ট এডিটর, মহারাজা আর ফকির দুয়ে মিলেমিশে কাজ করছে কেউ কোথাও কখনও দেখেনি!'

মহারাজা ফকিরবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হেসে বললেন 'শরৎ, আমার পরিণাম!'

দাদাঠাকুর বলতেন—'মহারাজার জবাবগুলোও বড় সুন্দর হতো, নিজে কবি ছিলেন কিনা।'

দীর্ঘদিন পরে মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের পুত্র মহারাজা যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে দেখা হয়েছিল দাদাঠাকুরের। যোগীন্দ্রনাথও ছিলেন রসিক মানুষ। তাছাড়া পিতৃবন্ধু দাদাঠাকুরের খুবই স্নেহভাজন তিনি।

মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে হেসে বেশ অভিমানের সুরেই বললেন—'পণ্ডিতমশাই, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আপনি আমার বাড়িতে একদিনও পায়ের ধুলো দিলেন না, অথচ আমার পিতৃদেবের আমলে কত আসতেন।'

দাদাঠাকুর—'আর আমার ষোলো টাকা মাইনের সেপাইয়ের ধাক্কা খেতে ইচ্ছা করে না। তোমার ফটকে যে পাহারাদার বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে সে মাইনে পায় ষোল টাকা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সেই সেপাই আমার বেশভূষা আর পৈতে দেখে মনে মনে অনুমান করবে—ভিক্ষে চাইতে এসেছে।'

মহারাজা—'আপনি কবে আসবেন—যদি বলেন, আমি নিজে ফটকে দাঁড়িয়ে থাকবো।'

কিন্তু দাদাঠাকুর এরপর আর কখনও আসেন নি নাটোরের রাজ-বাড়ীতে।

লালগোলার অধিপতি ছিলেন মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (রাও)। এই দানবীর মহারাজাকে দাদাঠাকুর বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন তাঁর সততার জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্যে অনেক পুষ্করিণী খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কারণে দাদাঠাকুর মহারাজাকে 'পানি-পাঁড়ে' বলতেন।

মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের বিশেষ নিমন্ত্রণে দাদাঠাকুর একবার লালগোলায় গিয়েছিলেন। মহারাজা নিজের প্রাসাদের প্রহরীদের বিশেষ সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন—'আমার অতিথি শরৎ পণ্ডিত মহাশয় আসবেন, তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই ; কাজেই তাঁর যেন অনাদর না হয়, তাঁকে সাদরে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

যথাকালে দাদাঠাকুর আসতে রাজকর্মচারীরা তাঁকে সসম্মানে

মহারাজার কাছে পৌঁছে দিলেন। মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ দাদাঠাকুরকে পেয়ে খুবই আনন্দপ্রকাশ করে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে আসতে আপনার কোন কষ্ট হয়নি তো?—আমার সমস্ত কর্মচারী এবং প্রহরীকে সতর্ক রেখেছিলাম আপনার যাতে অসুবিধা না ঘটে।'

দাদাঠাকুর—'আমার কোনই অসুবিধে হয়নি, আর আপনার প্রহরীরাও আমাকে যথেষ্টই সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু আমার একটা কৌতূহল হচ্ছে—আপনার ঐ প্রহরীরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে দেখলাম, ক'টা মেরেছে?'

মহারাজা—'ওরা মারেনি একটাও, তবে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেওয়াটা প্রথা।'

দাদাঠাকুর—'একটাও মারেনি! অথচ বন্দুক-কাঁধে চব্বিশ ঘণ্টায় পালা-বদল করে ওরা পাহারা দিয়ে চলেছে!'

মহারাজা—'যাইহোক, আপনার যে কোন রকম অসুবিধে হয়নি, এটা জেনে আমি খুবই আনন্দ পেলাম।'

এরপর দাদাঠাকুর এবং মহারাজা উভয়ে নানারকম আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। কথায় কথায় মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—'আপনার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কাগজটিকে যদি আরও বড় আকারে বার করা যায় আর তাতে সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা থাকে তাহলে কেমন হয়?—আমার ইচ্ছা আপনার পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।—এর জন্যে কি রকম টাকার প্রয়োজন হবে আপনি আমাকে বলুন।'

দাদাঠাকুর মহারাজার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন—'এখনই কিছু বলা সম্ভব হবে না।'

মহারাজ—'অনুমান করেই কিছু একটা আভাস দিন আপাততঃ, পরে সঠিক জানালে চলবে'খন।'



কিন্তু দাদাঠাকুরের কাছ থেকে কোন জবাবই পেলেন না মহারাজা, তাই অযাচিতভাবে নিজেই তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন 'জঙ্গিপুর সংবাদ'কে সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং আকারে বড় করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা একথাও জানালেন যে, এই পঁচিশ হাজার টাকা তিনি ঋণ হিসাবে দিচ্ছেন না।

একটু চিন্তা করে দাদাঠাকুর বললেন—'মহারাজ, আমার অনেক-দিনের বাসনা বড়োলোক হবার, আর আপনার মতো বড়োলোক হবার ইচ্ছাই আমার বেশি। তবে আপনার দানের টাকায় ব্যাবসা করে আপনার মতো ধনী হওয়া যাবে না।'

নির্লোভ দাদাঠাকুর অতি সহজেই পঁচিশ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন দেখে সরল প্রাণ মহারাজা মুগ্ধ হলেন, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না।

এর বেশ কয়েক বছর পরে একবার দেড় হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে দাদাঠাকুর মহারাজার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন দলিল সই করে এবং সেই ঋণ পরিশোধও করেছিলেন।

কথা প্রসঙ্গেই দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন মহারাজা—'আপনি পুজো করেন তো?'

দাদাঠাকুর—'আমি পুজোপাঠ করি না বা কখনো অঞ্জলিও দিই না।'

মহারাজা—'কারণটা কি যদি বলেন।'

দাদাঠাকুর—'মন্ত্র উচ্চারণে কেবল দেহি দেহি-ই শুনতে পাই। যখন ভগবান সবই দিয়েছেন, হাত-পা-চোখ-জিহ্বা-বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তি তখন তাঁর কাছে আরও কিছু চাওয়া কি উচিত, মহারাজ? মন্ত্র ঠিকভাবে যদি উচ্চারণ করতেই হয় তাহলে প্রথমেই বলতে হয়—বিষ্ঠাং বমনং উচ্ছিষ্টং।'

দাদাঠাকুর উচ্চারিত এই নবমন্ত্র শুনে মহারাজা সবিস্ময়ে এই মন্ত্রের অর্থ জানতে চাইলেন।



দাদাঠাকুর—'বটবৃক্ষের ডালপাতা প্রয়োজন হয় পূজার সময় গঙ্গাজলের-ঘটে, তাতেই দেওয়া হয় শান্তির জল। বটবৃক্ষ রোপণ করতে হয় না—কাক-পক্ষীর বিষ্ঠাতেই থাকে বট-অশত্থের বীজ।—তাই বললাম 'বিষ্ঠাং'। মধু না হলে পূজার নৈবেদ্য পূর্ণ হয় না।—সেই মধুই মৌমাছিরা নানান্ ফুল থেকে সংগ্রহ করে এনে নিজেদের চাক তৈরি করে তা'তে বমি করে রাখে।—মৌমাছির সেই চাক ভেঙেই মধু নিয়ে পূজোয় লাগাতে হয়।—তাই বলি 'বমনং'। আর বাছুরে তাদের মায়ের বাঁটে মুখ দিয়ে টেনে দুধ বের করে না দিলে গাভীদের বাঁটে দুধ আসে না। গাভীর বাঁটে দুধ এলে তখনই বাছুরকে টেনে সরিয়ে দিয়ে দুধ নেওয়া হয় পূজোর জন্যে।—কিন্তু বাছুরে মুখ-দেওয়া সেই বাঁট না ধুয়েই এটা করা হয়ে থাকে, তাই বলি 'উচ্ছিষ্টং'।'

মহারাজা দাদাঠাকুরের এই যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে হেসে উঠলেন, তারপর একটু চুপি চুপিই তিনি বললেম—'আমার কাছে যা বললেন, তা বললেন; কিন্তু আপনার এই উত্তম যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাটি আর কারোর কাছে যেন প্রকাশ করবেন না।—এটা যদি ব্রাহ্মণদের কানে ঢোকে তাহলে আর টিঁকতে দেবে না আপনাকে।'

মহারাজার প্রাসাদে দরিদ্র মানুষদের জন্য সব রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করাই থাকতো। ছিন্নবস্ত্র বা ছিন্ন শাড়ী পরিহিত কেউ নজরে পড়লেই মহারাজা নিজ কর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন পরনের বস্ত্র দেবার জন্য। দাদাঠাকুরকে জানালেন—'পণ্ডিত মশাই, মায়ের জাত, অর্ধ উলঙ্গ—চোখে দেখা যায় না, তাই এই ব্যবস্থা রেখেছি।'

রেডিয়োতে দাদাঠাকুরের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মুক্তাগাছার মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী। চিঠিতেই নিমন্ত্রণ তিনি জানান

—মুক্তাগাছাতে যাবার জন্য দাদাঠাকুরকে। বৃদ্ধ বয়সে কলকাতায় এসে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করায় অক্ষমতার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি ঐ চিঠিতেই।

পত্রোত্তরে দাদাঠাকুর জানালেন মুক্তাগাছাতে যাবেন এবং এরপর নির্দিষ্ট দিনেই তিনি মুক্তাগাছাতে পৌছলেন। সেখানেও মহারাজা জগৎকিশোর তাঁর প্রাসাদরক্ষীদের সতর্ক রেখেছিলেন যাতে খালি গায়ে খালি পায়ে দাদাঠাকুরকে দেখে কেউ যেন অবজ্ঞা না করে এবং তাঁর যথোচিত সম্মান দিতে যেন কোন রকম ত্রুটি না ঘটে।

দাদাঠাকুরের গুণমুগ্ধ মহারাজা জগৎকিশোর তাঁর মাননীয় অতিথির সাহচর্যে কয়েকদিন আনন্দে কাটালেন। যেদিন দাদাঠাকুর মুক্তাগাছা থেকে ঘরে ফিরে যাবেন সেদিন বৃদ্ধ মহারাজার মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর সেই ভারাক্রান্ত মন নিয়েই দাদাঠাকুরকে জানালেন—'আপনি আমার অতিথি, তাই আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছুক।—আপনিই বলুন কি দিলে ভাল হয়।'

দাদাঠাকুর—'যাতায়াতের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিলেই হবে।'

মহারাজা—'সে তো দেবোই, তাছাড়া আর কি দেবো তাই বলুন আপনি।'

দাদাঠাকুর—'মহারাজ, আমি কারোর কোনো দান গ্রহণ করি না। তাছাড়া শুনেছি আপনার এস্টেটের কিছু ঋণ আছে, কিন্তু আমার এস্টেটের ঋণ নেই।'

মহারাজা বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই বললেন—'পণ্ডিত, সবই তো জানেন, ঋণ কেন হয়েছে আমার। যাইহোক, আপনাকে আমার কিছু দেবার ইচ্ছাও আছে আর আপনার কাছ থেকে একটি জিনিস নেবারও ইচ্ছা আছে।'

দাদাঠাকুর বিস্মিত হলেন—'আপনার এমন কি নেবার বাসনা আছে আমার কাছে?'

মহারাজা—'আপনার ব্যবহৃত ছাতাটি আমাকে দিন, ছাতাটি



আমি আমার লাইব্রেরী সংলগ্ন মিউজিয়ামে রাখবো।—আপনাকে একটি নতুন ছাতা উপহার দেবো আজ।—এবার বলুন আপনাকে আমি কি দেবো যা আপনার কাজে লাগবে?'

দাদাঠাকুর—'আমাকে একটা মাটির ভাঁড় দিন, ট্রেনে যাবার সময় জল খেতে পারবো।'

রাজকুমার কাছেই ছিলেন। মহারাজা পুত্রকে বললেন—জলপানের জন্যে ভাল একটা পাত্র এনে দাও 'পণ্ডিতমশাইকে।'

পিতার আদেশে রাজকুমার একটি ভাঁড় এনে দাদাঠাকুরের সামনে রাখলো। নিজ পুত্রের সামনেই মহারাজা হেসে দাদাঠাকুরকে বললেন—'পণ্ডিতমশাই, আপনি আপনার মতো কথা বলেছেন, আমার ছেলে কিন্তু তার নিজের মতো করেনি।' তারপর পুত্রকে বললেন—'পণ্ডিতমশাই নিজের মতোই বলেছেন, কিন্তু তুই তোর মতো কর। বাজারে যা, গিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কুঁজো নিয়ে আয়—যার ভেতরে ছোট গেলাস আর মাথায় প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনা রয়েছে।'

রাজপুত্র তখন গাড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটি ভালো কুঁজো নিয়ে এলো। মহারাজা নিজের হাতে সেই কুঁজোটি উপহার দিলেন দাদাঠাকুরকে।

দাদাঠাকুর একটু হেসে বললেন—'মহারাজ, আপনি আমাকে যা উপহার দিলেন, তাতে আমার রাতের ঘুমের ব্যাঘাত করলেন। সারা রাত জেগে রেলের গাড়িতে আমাকে ঐ কুঁজো আর নতুন ছাতা পাহারা দিতে হবে—পাছে বেহাত হয়ে যায়।'

দাদাঠাকুরের কথা শুনে মহারাজা এবং তাঁর পুত্র বেশ কৌতুক উপভোগ করলেন।

কাশীমবাজার রাজপরিবারের সঙ্গেও দাদাঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাশীমবাজারের রানী আন্নাকালী দেবী দাদাঠাকুরের পূর্ব পুরুষকে কিছু জমি-জায়গা দান করেছিলেন।

রানী আন্নাকালী দেবীর স্বামী রায় বাহাত্বর অন্নদাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁর বহুবিধ গুণের জন্য বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিলেন। তদানীন্তন ইংরাজ সরকার তাই অন্নদাপ্রসাদকে 'রাজাবাহাত্বর' উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব গেজেটে তুলেছিলেন, কিন্তু অন্নদাপ্রসাদ কলকাতায় এসে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, সেজন্য নিজের হাতে আর 'রাজাবাহাত্বর' উপাধি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর সরকার স্থির করেন অন্নদাপ্রসাদের স্ত্রী রানী আন্নাকালী দেবীকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করবেন।

সে সময়ে বাংলার ছোটলাট ছিলেন স্যার জন্ উডবার্ণ। তিনি কাশীমবাজার রাজবাটীতে নিজেই গিয়েছিলেন আন্নাকালী দেবীকে উপাধিদানের প্রস্তাব জানিয়ে তাঁর সম্মতি নিতে। রানী আন্নাকালী দেবী লাটবাহাত্বরকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা জানালেন। সে যুগের মহিলারা পর্দানসীন ছিলেন। তাই রানী আন্নাকালী দেবী পর্দার আড়ালে থেকেই ছোটলাট বাহাত্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন, দোভাষীর কাজ করেছিলেন তদানীন্তন রাজ এস্টেটের ম্যানেজার।

ছোটলাট উড্‌বার্ণ রানী আন্নাকালী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনার মহত্তের কথা ইংরাজ সরকার বিশেষভাবে অবগত আছেন। আপনার স্বর্গীয় স্বামীও ছিলেন মহৎ ব্যক্তি। তাও আমরা জানি। আমি আপনাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, আপনি সরকার প্রদত্ত এই উপাধি গ্রহণ করলে আনন্দিত হব।'

পর্দার আড়াল থেকেই রানী তাঁর এস্টেটের ম্যানেজারকে বললেন—'ম্যানেজারবাবু, ছোটলাট বাহাত্বরকে আমার অভিনন্দন

জানিয়ে দিন। ছোটলাট বাহাদুর আমার বাড়ীতে এসেছেন, সেজন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওঁকে বলুন—আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের বিধবা। আমার কোন অলঙ্কার সাজে না। যদি কোন অলঙ্কারে সরকার বাহাদুর একান্তই ভূষিত করতে চান তবে সেই অলঙ্কার আমার ছেলের জন্য তোলা থাক।'

বিস্মিত হয়েছিলেন ছোটলাট বাহাদুর এবং পরে রানী আন্নাকালী দেবীর পুত্র আশুতোষ রায়কে 'রাজাবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

রানী আন্নাকালী দেবীর পৌত্র রাজা কমলারঞ্জনের মাতৃদেবীর নিমন্ত্রণে দাদাঠাকুর কাশীমবাজারে গিয়েছিলেন রাজা কমলারঞ্জনের নব বধূরানীকে আশীর্বাদ করতে। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নববধূকে মামুলী প্রশ্ন করছিলেন। যেমন—গান জানা আছে কিনা, সেলাই, হাতের কাজ ইত্যাদির খবরও জানতে চাইলেন ওঁরা। নীরবে দাদাঠাকুর সব রকম প্রশ্নই শুনছিলেন। রাজা কমলারঞ্জনের মাতৃদেবী দাদাঠাকুরকে বললেন—'পণ্ডিতমশাই, আপনি আমার বৌমাকে কোন প্রশ্নই তো করলেন না?'

দাদাঠাকুর তখন বধূরানীকে জিগ্যেস করলেন—'মা, থোড় কুটতে জানো তুমি?'

বধূরানী ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তিনি থোড় কুটতে পারেন। দাদাঠাকুর আবার প্রশ্ন করেন—'মা, ভাতের ফ্যান গালতে পারো?'

বধূরানী হেসে বললেন—'হ্যাঁ, পারি।'

কাশীমবাজার এস্টেটের ম্যানেজারবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন—'পণ্ডিতমশাই, থোড় কোটা, ভাতের ফ্যান গালা আপনার আমার মতো গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের কাজ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন—এটা রাজবাড়ী, এখানে দাসদাসীরাই ঐ সব কাজ করে।'

দাদাঠাকুর—'ম্যানেজারবাবু, আপনিও ভুলে গেছেন—মুর্শিদাবাদ জেলায় একজন নবাব বাহাদুর আছেন—তারপর লালগোলার মহারাজা

আছেন, আর তারপর কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তো এইখানেই উপস্থিত রয়েছেন।—সব রাজা-মহারাজার চাইতে অনেক বড় মহারানী ছিলেন দ্রৌপদী, তিনি ভীমের ভাতের ফ্যান গালতেন।—তাই বলি অহঙ্কার করবার কিছুই নেই।'

সেইখানেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চুপি চুপি বললেন—"পণ্ডিতমশাই, আমার স্ত্রী-ও ঘুঁটে দিতে পারতো, কিন্তু মহারানী হবার পর আর পারে না।'

দাদাঠাকুরও চুপি চুপিই বললেন—'মহারাজা বাহাদুর, রানী-মহারানীর প্রসব-বেদনা হলে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না এবং সেজন্য রিহার্সালও দেওয়া থাকে না।—রানী-মহারানীকেই সেই বেদনা সহ্য করতে হয়, সেখানেও দম্ভ করার কিছুই থাকে না। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বৌদের যেমন হয়ে থাকে—রানী-মহারানীদেরও তেমনি হয়, ধনী বলে বেদনা কিছু কম হয় কি?'

১৩২৯ সালের ৬ই মাঘ দাদাঠাকুর আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। সেটির নাম 'বিদূষক'। পত্রিকাটি ধামাধরা উদরপন্থীদের মুখপাত্র" ব'লে উল্লেখ ছিল। প্রচ্ছদে থাকতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একটি ব্যঙ্গচিত্র—তার কপালে "দুঃখ" বক্ষে "দুরাশা" আর উদরের উপর লেখা "উদর রে তুঁহু মোর বড়ি দুশমন।" "এডিটার" শব্দটি ইংরাজিতে "Aid-eater" (এড্‌-ইটার) বলে ছাপা হোতো।

প্রথম বর্ষ ৬ই মাঘ ১৩২৯ শনিবার—'প্রথম হর্ষ'-এ (দাদাঠাকুর 'সংখ্যা' স্থলে 'হর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন) দাদাঠাকুর পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য জানালেন—

বিদূষকের আত্মকথা

"জন্ম আমার জঘন্য স্থান পল্লীগ্রামের জঙ্গলে,
দেশের মঙ্গল যেমন তেমন নিজের পেটের মঙ্গলে,
আজ রাত্তিরে ভ'রে রাখি খালি আবার কালকে তা
পেটের জ্বালায় 'বিদূষক' চ'লে এলেন কল্‌কাতা।
যে বাজারে বহুৎ কাগজ—হাজার হাজার সাহিত্যিক,
সে বাজারে পাড়াগেঁয়ে থাক্‌তে কি আর পারবে ঠিক ?
(তবে) যে বাজারে মুক্তা বিকায়, বিকায় নাকি তুচ্ছ কুঁচ ?
যে হাটেতে হীরক বিকায়, বিকায় নাকি সেথায় ছুঁচ ?"

প্রথম এক বছর তিনি এই পত্রিকাটি জঙ্গিপুরের ছাপাখানা থেকে ছেপে এনে কলকাতায় ফিরি করতেন। কলকাতায় তখন 'বিদূষক'-এর আস্তানা ছিল ১৯৫নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। সেই সময়কার তাঁর পারিবারিক নানাবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে দাদাঠাকুর কলকাতায় বাগমারীতে ভোলানাথ মিত্রের বাড়ির সংলগ্ন একটি ছোট 'আউট-হাউস'-এর কিছু অংশ ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে ঐ বাড়ির দারোয়ানের ঘরের পাশের ছোট একটি কামরায় তাঁর ছাপাখানা করেন। ১৩৩১ সালের বৈশাখ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের 'বিদূষক'-এর কাজ এখান থেকে শুরু হোলো। প্রথমে 'বিদূষক'-এর দাম ছিল এক আনা (তখনকার চার পয়সা)। সেই সময় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'অবতার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, দাম এক পয়সা। অগত্যা 'বিদূষক'-এর দাম দাদাঠাকুর কমিয়ে এক পয়সা করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলতেন—'ভাই, আমি কাগজ বের করিনি, কাগজই আমাকে পথে বের করেছে।' 'বিদূষক'-এ থাকতো কবিতা ও ছড়ার ছড়াছড়ি। সেগুলির রচয়িতা

ছিলেন তিনি নিজেই এবং পথে পথে গান গেয়ে ফিরিও করতেন তিনি, সেই এক পয়সার কাগজ 'বিদূষক' অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বহু গুণী-জ্ঞানী মানুষের সংস্পর্শে আসার ও তাঁদের সাহচর্য-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করবার সুযোগও ঘটলো দাদাঠাকুরের। নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, গজেন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ—সকলেই দাদাঠাকুরের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রতি সংখ্যা বিদূষক পঞ্চাশটি করে কিনতেন তাঁর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন দাদাঠাকুরের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। দাদাঠাকুরও তাঁকে আপন কনিষ্ঠের মতোই স্নেহ করতেন। কাগজ ফিরি করতে করতে প্রায়ই দাদাঠাকুর নির্মলবাবুর বাড়িতে হাজির হতেন। অল্পক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়তেন কাগজ ফিরি করতে। নির্মলবাবু জানতেন যে, দাদাঠাকুর প্রায়ই অভুক্ত অবস্থায় পথে পথে কাগজ বিক্রি করেন। তাই, তিনি বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা ভীম নাগের দোকানের তদানীন্তন মালিক মানিক নাগকে গোপনে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন: তাঁর দোকানের সামনে দিয়ে দাদাঠাকুরকে যেতে দেখলেই তাঁকে যেন কিছু জলযোগ করিয়ে দেন এবং হিসাবের বিল মাসকাবারে পাঠান। এরপর থেকে মানিকবাবু দাদাঠাকুরকে দেখলেই সাদরে আপ্যায়িত করে কিছু জলযোগ করাতেন। দু'চারদিন এইভাবে আপ্যায়িত হবার পর তীক্ষ্ণবুদ্ধি দাদাঠাকুরের মনে সন্দেহ জাগলো, এই আপ্যায়নের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু একটা রহস্য আছে! অল্পদিনের মধ্যেই কৌশলে রহস্যটি জানতে পেরে ভীম নাগের দোকানের রাস্তা এড়িয়ে

অন্যপথে যাতায়াত শুরে করেছিলেন দাদাঠাকুর। দরিদ্র হলেও এমনই ছিল তাঁর আত্মসম্মানবোধ।

বিজ্ঞাপন না ছাপালে কাগজ চালানোর পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। সেই কারণে দাদাঠাকুর বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের কাছে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার—'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর জন্য বিজ্ঞাপনের আশায় তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন কেশরঞ্জন তেলের আবিষ্কর্তা স্বনামধন্য কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কাছে। একদিন গিয়ে নগেনবাবুর সামনে দাঁড়ালেন। দাদাঠাকুরকে দেখে নগেনবাবু রোগী অনুমানে প্রশ্ন করেন—'আপনার কি হয়েছে?'

দাদাঠাকুর একটু ধীর অথচ সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন—'আমি দারিদ্র্য ব্যাধিতে ভুগছি; যাতে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ মেলে সেই 'ঔষধ'-এর জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

নগেনবাবু খানিক বিস্মিত হয়ে তখনই তাঁর অনতিদূরে রোগীর চিকিৎসারত আর এক বৃদ্ধ কবিরাজকে বললেন—'কবরেজ মশাই, ইনি এসেছেন দরিদ্রতাগ্রস্ত ব্যাধি সারাবার জন্যে—উপযুক্ত কোন ওষুধ দিতে পারেন?'

কবিরাজ মহাশয় বললেন—'ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

দাদাঠাকুর সেই বৃদ্ধ কবিরাজটির কাছে গিয়ে বললেন—'দরিদ্রতা-ব্যাধির ওষুধ নিতে এসেছি।'

কবিরাজ মহাশয় দাদাঠাকুরের কাছে সব কিছু শুনে ধীরে ধীরে বললেন—'আমরা রোগের জন্যে সব সময় ওষুধ দিই না, পথ্যের নির্দেশ দিই। আপনার ব্যাধির জন্যে 'আকাঙ্ক্ষারূপ কুপথ্য একেবারেই বর্জনীয়।—আপনার ব্যাধি নিরাময় হবে।'

দাদাঠাকুর বলতেন—'ভাই, এই কবিরাজের কাছে হারলাম।

কবিরাজটি ইংরাজী জানতেন না, অথচ বাংলা ও সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর।'

নগেনবাবু কেশরঞ্জন তেলের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। পরে জবাকুসুম কার্যালয়ে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে দাদাঠাকুর দেখা করেছিলেন, সেখান থেকেও জবাকুসুমের বিজ্ঞাপন পেয়েছিলেন এবং এখনও 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ সেই বিজ্ঞাপন দেখা যায়।. এরপর সেন বাড়ীর প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

দাদাঠাকুর একবার কেশরঞ্জনের বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে পুঁটলির মধ্যে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ করলেন; তারপর হাওড়া স্টেশনে রওনা হবেন বাড়িতে ফেরার জন্যে এমন সময় পুঁটলি খুলে টাকা বের করতে গিয়ে দেখেন পুঁটলিতে টাকা নেই! এতে খুবই চিন্তিত হলেন তিনি এবং একটু লজ্জিতভাবেই ঘটনাটি নগেনবাবুকে জানালেন। শুনে নগেনবাবুও বিচলিত হলেন, শুধু তাই নয়—তাঁর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটবার জন্য তিনি লজ্জিত ভাব দেখালেন। দাদাঠাকুরকে বললেন—'টাকা আমি বের করাবো—আপনি বসুন, টাকা না নিয়ে যাবেন না।'

নগেনবাবু বেশ উত্তেজিত হয়েই সকলের কাছে বললেন—'খুবই আশ্চর্য ঘটনা, এমন কখনও এখানে ঘটেনি। যাই হোক, যেই নিয়ে থাকো—টাকা বের করে দাও।'

লজ্জিত দাদাঠাকুরকে ভরসা দিয়ে নগেনবাবু বললেন—'আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই। টাকা না নিয়ে আপনাকে যেতে দেবো না। আজ না হয় আপনার বাড়ি ফেরা না হোলো।' নগেনবাবুর উদ্দেশ্য—দাদাঠাকুরকে ধরে রেখে একত্রে আহার করা।—হোলোও তাই। রাত্রে আহারের পর নগেনবাবু জানালেন—টাকা পাওয়া গেছে। অগত্যা রাত্রে সেখানে থাকতে হোলো দাদাঠাকুরকে; উদ্দেশ্য সফল হলো নগেনবাবুর।

পরের দিন নগেনবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাদাঠাকুর হাওড়া স্টেশনে গেলেন। স্টেশনে টিকিট কিনতে গিয়ে দাদাঠাকুর পড়লেন আর এক সমস্যায়। পুঁটলি খুলে দেখেন—নগেনবাবুর দেওয়া বিজ্ঞাপনের টাকা নেই, তার বদলে তার জায়গায় রয়েছে একখানি একশো টাকার নোট! এতক্ষণে দাদাঠাকুর অনুমান করতে পারলেন যে, এই সকল অঘটনের মূল হচ্ছেন নগেনবাবু, তিনিই আমার অজ্ঞাতে এত সব কীর্তি করেছেন।

একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনা বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। হাওড়া স্টেশনে জঙ্গিপুরের এক ব্যবসায়ীকে দেখতে পেলেন দাদাঠাকুর। সেই ব্যবসায়ী সমস্যার সমাধান করেছিলেন একসঙ্গে দুখানি টিকিট কিনে এবং পরে জঙ্গিপুর থেকে দাদাঠাকুরের জন্য কেনা টিকিটের দাম ফেরত নিয়ে।

কলকাতায় 'বিদূষক' ফিরি করার সময় দাদাঠাকুর বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সমবয়সী বহু সাহিত্যিক বন্ধুও পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় ছিলেন দাদাঠাকুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়ো। পথে ঘাটে দেখা হলেই জলধরবাবু যারপর নাই আনন্দিত হতেন দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে। জলধরবাবুকে একদিন দাদাঠাকুর বললেন—'দাদা, বড় সরল লোক আপনি।'

হেসে প্রশ্ন করলেন জলধরবাবু—'শরৎ, একথা কেন বলছো?'

দাদাঠাকুর সহজ উত্তরেই বললেন—'দাদা, আপনার দ্বিতীয় ভাগের বালাই নেই।—প্রথম ভাগেই শেষ!—জ-ল-ধ-র—একেবারেই সহজ-সরল আকার-উকার নেই।

একদিন 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ের সামনে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে জলধরবাবু গুরুদাসবাবুর পুত্র হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন,

এমন সময় দাদাঠাকুরকে পথে যেতে দেখে ডেকে বললেন—'শরৎ, কেমন আছো ভাই ?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'ভালো আছি। দাদা, আপনি ভালো আছেন তো ?'

জলধরবাবু হরিদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি শরৎকে চেনো না ?'

হরিদাসবাবু বহুবার আর্ট থিয়েটার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে এবং আরও অনেক জায়গায় ওঁকে দেখেছেন, চিনতেন, আলাপ ছিল না। কিন্তু তখন বললেন—'না, চিনি না।'

জলধরবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন—'শরৎ, তুমি হরিদাসকে চেনো না, ইনি গুরুদাসবাবুর ছেলে।'

চিনেও 'চিনি না' বলতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে জলধরবাবুকে দাদাঠাকুর বললেন—'দাদা, এই ফুটপাথ দিয়ে যাই-আসি, দেখি ফুটপাথের ধারে বসে বই কেনাবেচা করছেন—আমি হরিদাসও চিনি না আর গুরুদাসও চিনি না।'

কয়েকবার সাহিত্য সভা হয়েছে জঙ্গিপুরে। একবার জলধরবাবু সভাপতিত্ব করতে গেলেন সেখানে। সেদিনের সেই সভায় জলধরবাবু বলেছিলেন—'যেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হোক না কেন, যে ক'দিন আমাকে থাকতে হবে—আমি দু'বেলাই শরতের বাড়িতেই আহার করবো। শরৎ এখানে থাকতে তোমরা আমাকে সভাপতি করে আনলে কেন ?—গেঁয়ো-যোগী ভিখ পায় না।'

দু'বেলাই জলধরবাবু দাদাঠাকুরের বাড়ীতে আহার করতেন। নিজেই বলে দিতেন অতি সাধারণ আহারের বন্দোবস্ত করতে। পান্তা ভাত নেবু আর নুন দিয়ে অতি অবশ্যই যেন থাকে—আহারের মধ্যে। দাদাঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতেন জলধরবাবুকে।

আর একবার জঙ্গিপুরের সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করতে

গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি চুপি চুপি দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন—'ভাই শরৎ, তুমি আমার কিছু উপকার করবে—যে ক'দিন আমি এখানে থাকবো—সে ক'দিন। আমি লোকালয়ে হাঁপিয়ে উঠি, তুমি রোজ বিকেলে একটু নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে যাবে আমাকে? সঙ্গে তুমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।—দুজনে শ্মশানে গিয়ে নির্জনে বসে থাকবো বেশ কিছুক্ষণ।' দাদাঠাকুর শরৎবাবুর এই 'উপকার' করেছিলেন।

বাগমারীতে বাসা বেঁধে কলকাতার পথে পথেই ফিরি করতে লাগলেন 'বিদূষক'। এই ফিরি-করার সময় দাদাঠাকুর যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা তিনি গল্পচ্ছলে প্রায়ই বলতেন। একদিন তিনি বললেন:

'ভাই, তখন বাগমারীতেই থাকি। 'বিদূষক' ফিরি করতে করতে চলেছি, এমন সময় বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (এখন বিধান সরণী হয়েছে) মোড়ে একটা বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক ডাকলেন। ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি বললেন—'কি কাগজ ওটা, দেখি।' একখানি 'বিদূষক' তাঁকে দিলাম, তিনি আমাকে বসতে বলে কাগজটি মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই তাঁকে বললাম—'আপনি পড়ুন, আমি পরে এসে দাম নিয়ে যাবো, কাগজের দাম এক পয়সা। এখন আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে, সময় কম।' এমন সময়ে এক ভদ্রমহিলা একটি রেকাবিতে কিছু জলখাবার ও এক গ্লাস জল নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি আমার সামনে ঐগুলি রেখে বললেন—'একটু জলযোগ করুন।'

আমি তো বিস্মিত, ভাবছি—ব্যাপারটা কি হলো! কাগজ কিনবেন—একটা পয়সা দেবেন—এর মধ্যে আবার জলযোগের ব্যবস্থা কেন! বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললাম—'আমি তো এখন

কিছু খাবো না, আপনি যদি কাগজটা রাখেন তাহলে একটি পয়সা দিন, অনেক জায়গাতে যেতে হবে এখন আমাকে।'

উত্তরে ওঁরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বললেন—'তা আমরা জানি।—আপনি খেয়ে নিন।'

জলযোগ সেরে কাগজের দাম নিয়ে চলে আসছি, এমন সময় তাঁরা দুজনেই বললেন—'কাগজ যেন নিয়মিত আমাদের কাছে পৌঁছায়।'

পরে যখন কাগজ নিয়ে আর একদিন গেলাম, দেখি নলিনীকান্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরও অনেকে বসে রয়েছেন সেখানে। তখন বুঝলাম নলিনীকান্তই চুপি চুপি আমার কথা ভদ্রলোকটিকে বলেছে। আমার পরিচয় পেয়ে এক পয়সার কাগজ নেবার ভাণ করে আমাকে তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসায় আবদ্ধ করার ইচ্ছা।

এরপর নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ হলো সেখানে। ভদ্রলোক সাহিত্যরসিক এবং গুণী, তাঁর নাম গজেন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনি সেখানে উপস্থিত সকলেরই শ্রদ্ধার এবং ভালোবাসার দাদা। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী পুরসুন্দরী ঘোষও ছিলেন সুরসিকা এবং সেখানকার সকলেরই শ্রদ্ধার বৌদি।

প্রতি সন্ধ্যায় রসিকজনদের আড্ডা বসতো, শুধু সাহিত্য চর্চাই নয়, সেখানে শিল্পকলা এবং নানান্ বিষয়ের উপর আলাপ-আলোচনা হোতো। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের পিতৃদেবের মাতুলালয় গজেন-বাবুদের বাড়ি।

এক সন্ধ্যায় গজেনবাবুর আসর জমে উঠেছে। এমন সময় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় উপস্থিত হয়ে দাদাঠাকুরকে বললেন—'আমার মা আজকে একটি ব্রত করেছেন। তাঁর ইচ্ছে—কোনো সৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো। তা আমি সৎ ব্রাহ্মণ পাইনি, তবে যখন হাতের কাছে আপনাকে পেলাম তখন আপনিই চলুন।'

দাদাঠাকুর নির্মলবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলেন। নির্মলবাবুর মা বিশেষ আনন্দিত হয়ে দাদাঠাকুরকে সযত্নে ভোজন করালেন। ভোজনপর্ব শেষ হোলে দাদাঠাকুরকে তিনটি টাকা দিয়ে বললেন—'আপনি ট্যাক্সি করে বাড়ি যান, রাত হয়েছে।' দাদাঠাকুর কিন্তু পদব্রজে বাগমারীতে ফিরলেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় দাদাঠাকুর গজেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সেখানে নির্মলবাবু বসে আছেন। দাদাঠাকুর হেসে বললেন—'গতকাল তিন পুরুষের এ্যাটর্নিকে তিন টাকা ঠকিয়েছি। ট্যাক্সিভাড়া তিন-টাকা নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরেছি।'

নির্মলবাবু শুনে দাদাঠাকুরকে বললেন—'আমার স্ত্রীর ব্রত আছে আজ। আপনাকে যেতে হবে।' দাদাঠাকুর নির্মলবাবুর সঙ্গে গেলেন। সেদিন ভোজনের পর নির্মলবাবু তাঁর কর্মচারীকে একটি ট্যাক্সিতে দাদাঠাকুরকে উঠিয়ে দিতে বললেন এবং তিনটি টাকা দাদাঠাকুরকে দিলেন। নির্মলবাবুর ব্যবস্থা মতো দাদাঠাকুরকে ট্যাক্সিতে উঠতে হোলো।

পরের সন্ধ্যায় আবার দাদাঠাকুরের সঙ্গে গজেনবাবুর আসরে দেখা হোলো নির্মলবাবুর। দাদাঠাকুর হেসে বললেন—'গতকাল আবার আমি তিন পুরুষের এ্যাটর্নিকে আড়াই টাকা ঠকিয়েছি। ট্যাক্সি থেকে মেডিকেল কলেজের সামনে নামলাম আর ট্যাক্সিভাড়া আট আনা পয়সা দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেলাম।'

নির্মলবাবু একটু চিন্তা করে বললেন—'দাদাঠাকুর, আজ আমার নিজের একটা ব্রত আছে, আপনাকে ভোজন করিয়ে আনন্দিত হবো, আপনি চলুন।' দাদাঠাকুর সেদিনও গেলেন। নির্মলবাবুর মা এবং নির্মলবাবুর স্ত্রী দাদাঠাকুরকে দেখে খুব হাসতে লাগলেন। নির্মলবাবুর মা নির্মলবাবুকে প্রশ্ন করলেন—'আজ কি ভোজন করাবে ব্রাহ্মণকে ?' উত্তরে নির্মলবাবু বললেন—'মা, আজ আমার ব্রত, সেজন্যে দাদাঠাকুর যা খেতে চাইবেন, আমি তাই খাওয়াবো।'

চুপি চুপি নির্মলবাবুর মা দাদাঠাকুরকে বললেন—'বাবা তুমি বলো—কড়াইশুঁটি আর কিসমিস দিয়ে ভাজামুগের ডালের খিচুড়ি খাবো।'

দাদাঠাকুর সেই কথাই বললেন।—নির্মলবাবু একটু চিন্তিত হলেন, তার কারণ সেটা কড়াইশুঁটির সময় নয়। কিন্তু তবুও পেছপা হলেন না। নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী সরকারমশাইকে ডেকে নির্দেশ দিলেন—গাড়ি নিয়ে হগ্ মার্কেটে গিয়ে মার্কেট সুপারিন্‌টেনডেণ্টকে নির্মলবাবুর নাম করে এক সের কড়াইশুঁটি কিনে দেবার জন্য বলতে।

গাড়ি নিয়ে সরকার মশাই নির্মলবাবুর নির্দেশমতো সুপারিন্-টেনডেণ্টের সাহায্যে অনেক দাম দিয়ে এক সের কড়াইশুঁটি কিনে আনলেন। সে রাত্রে দাদাঠাকুরের আহারের পর নির্মলবাবুর মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, তিনি যেন একটু চিন্তিত। দাদাঠাকুরের সঙ্গে তিনি বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দাদাঠাকুর অনুমান করেছেন আজ শুধু হাতেই বাড়ি ফিরতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছেন বাড়ি ফেরার জন্য, তখন দাদাঠাকুর দেখলেন নির্মলবাবুও তাঁর পিছনে পিছনে আসছেন। দাদাঠাকুর সদর দরজা পার হয়ে ফুটপাথে পা দিলেন, এমন সময় তাঁর পিছনে নির্মলবাবু এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সরকারমশাইও ছিলেন।

হগ্‌মার্কেট থেকে কড়াইশুঁটী আর কিসমিস কিনে এনে খিচুড়ী রান্না করে আহার করতে দাদাঠাকুরের বেশ রাত হয়েছিল। নির্মলবাবু একটা রিকসাওয়ালাকে ডাকলেন। তাকে বললেন—'এই বাবুকে এঁর বাগমারীর বাড়ীতে পৌঁছে দেবে, আর কাল সকালে এসে আমার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে যাবে। সরকার মহাশয়কে বলে দিলেন পরদিন সকালে রিকসাওলাকে টাকা দেবার জন্য।

নির্মলবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন—'আজ ঠিক হোলো তো?'

দাদাঠাকুর উত্তরে বললেন—'আজ আট আনা ঠকাতে পারি,

মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে ওর কাছ থেকে আট আনা নিয়ে যাবো। কাল তো ও টাকা পাবেই।

'বিদূষক' ফিরি করতেন দাদাঠাকুর উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই। একদিন সকাল প্রায় দশটা নাগাদ রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে 'বিদূষক' ফিরি করছেন, এমন সময় ধূতি-পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, 'কি কাগজ?'

দাদাঠাকুর—'বিদূষক।'

ভদ্রলোক—'কত দাম কাগজের?'

দাদাঠাকুর—'বাবু, মাত্র এক পয়সা।'

ভদ্রলোকটি একখানি 'বিদূষক' নিয়ে অল্পক্ষণ দেখে বললেন—'এই কাগজ, এর দাম আবার এক পয়সা!—আচ্ছা, দাও একখানা।'

একখানি কাগজ নিয়ে অফিসে চলে গেলেন ভদ্রলোকটি। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এসে বললেন—'দেখ, যদি একসঙ্গে বারোখানা কাগজ নিই তাহলে কি দিতে হবে—বলো।'

দাদাঠাকুর—'বারো পয়সা দেবেন।'

ভদ্রলোকটি নারাজ হলেন বারো পয়সা দিতে, বেশ গম্ভীর হয়েই বললেন—'এই কাগজ, এর আবার দাম এক পয়সা।'

খুবই বিনীতভাবে দাদাঠাকুর বললেন—'বাবু, আমি সামান্য ফিরিওলা, অপরাধ নেবেন না। আমার প্রশ্নে আপনার অসম্মান হবে না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে?'

ভদ্রলোকটি ভারী গলায় বললেন—'কি জানতে চাও তুমি?'

দাদাঠাকুর—'আপনি কোন্ আপিসে কাজ করেন?'

ভদ্রলোকটি রাইটার্স বিল্ডিং দেখিয়ে বলেন—'এই অফিসে।'

বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করেন দাদাঠাকুর—'কত মাইনে পান বাবু আপনি?'

ভদ্রলোকটি বিরক্ত হয়ে বললেন—'তুমি যে কুটুম্বিতা আরম্ভ করলে দেখছি!—একশো পঁচিশ টাকা মাইনে আমার।—এতে তোমার কি, বলো!'

দাদাঠাকুর—'বাবু, আপনার রোগা শরীর, তবুও সরকার আপনাকে একশো পঁচিশ টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছে, মস্তিষ্ক আপনার পরিষ্কার, কাজ ভালো হবে। আপনার ঐ একশো পঁচিশ টাকাতে পাঁচজন লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ মানুষকে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক হয়ত দুর্বল হবে।—আপনি যে কাজ করেন, ঐ পাঁচ-জন মিলে আপনার কাজ করতে পারবে না।'

ভদ্রলোকটি আর কথা বাড়ালেন না ফিরিওলার সঙ্গে। দশটি পয়সা দাদাঠাকুরের হাতে দিয়ে বারোখানি কাগজ নিয়ে চলে গেলেন।

দাদাঠাকুর বুঝলেন যে, ভদ্রলোকটি অফিসের বন্ধুদের অনুরোধে কাগজ কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি কাগজ নিয়ে চলে যাবার সময় তাই দাদাঠাকুর বলেছিলেন—'ভালো লেগেছে বলেই তো আবার এসে এতগুলো কাগজ কিনলেন।'

একদিন পথে দাঁড়িয়ে 'বিদূষক' ফিরি করার সময় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর গাড়ি থামিয়ে দাদাঠাকুরকে ডাকলেন। কুশল সংবাদ জানার পর বললেন—'বঙ্গীয় সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে, (খুব সম্ভব নৈহাটিতে), সেই সভায় আপনাকে যেতে হবে, আমি নিয়ে যাবো।—এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়।' বঙ্গীয় সাহিত্য সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর।

দাদাঠাকুর সভায় যোগদান করতে নারাজ হয়ে বললেন—

'মহারাজ, আমি ফুটপাথের সাহিত্যিক, দেহ থেকে দৈহিক, পেটের জ্বালায় পোয়েটিক, আমি সাহিত্য সভায় যাবো না।'

মহারাজা বিজয়চাঁদ—'আমি আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো, আপনি অমত করবেন না।'

দাদাঠাকুর—'যদি আমার একটি অনুরোধ আপনি রাখেন, যেতে পারি তাহলে।'

মহারাজা—'বলুন, কি অনুরোধ।'

দাদাঠাকুর—'আমার সামান্য বিঘে কয়েক ধানজমি রয়েছে, এর পরের বছর বঙ্গীয় জমিদার-সভার সভাপতি আপনি আমাকে করে দেবেন। সাহিত্য-সভার সভাপতি বর্ধমান মহারাজ যদি হতে পারেন, আমি কেন তাহলে 'বঙ্গীয় জমিদার-সভা'র সভাপতি হতে পারবো না বলুন?'

মহারাজা হেসে বললেন, আচ্ছা, আসছে বছরে বঙ্গীয় জমিদার সভার সভাপতি হবেন আপনি।'

এরপর যথাসময়ে মহারাজা দাদাঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সভায় গেলেন। দাদাঠাকুরের হাতে ছিল বড় একটি ক্যানভাসের ঝোলা-ব্যাগ। তার মধ্যে তাঁর ধূমপানের সব রকম সরঞ্জাম ছাড়াও ছিল একখানি গামছা। ব্যাগটি দেখে মহারাজা প্রশ্ন করলেন—'পণ্ডিত মশাই, ওটাতে কি?'

দাদাঠাকুর—'এটা আমার মানি-ব্যাগ।'

বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক সেই সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃদ্ধ অমৃতলাল বসু মহাশয় বসেছেন সভাপতির আসনে, তাঁর পাশে বসলেন মহারাজা বিজয়চাঁদ এবং নিজের পাশে তিনি বসালেন দাদাঠাকুরকে। অন্যান্য বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক উঁচু মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন অমৃতলালবাবু। তাঁর ভাষণে তিনি ভীষণ আক্রমণ করলেন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য দেবীকে। অমৃতলালবাবু তাঁর ভাষণে

বললেন—'আমি প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ, পক্ক কেশ, দন্ত বিহীন; আজ সাহিত্য দেবী আমাকে বরমাল্য দিয়ে পতিত্বে বরণ করলেন। আমার পূর্বে অভিনেতা গিরিশচন্দ্র, যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ এবং আরও অনেকে সাহিত্য দেবীর পূজা-সেবা আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে করেছেন, কিন্তু সাহিত্য দেবী তাঁদের কাউকেই বরমাল্য দিয়ে বরণ করেন নি!— আমরা নট, বারাঙ্গনা নিয়ে অভিনয় করি, আমরা অপাঙক্তেয়! এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সাহিত্য দেবী পতিত্বে বরণ করলেন, তাই অতি দুঃখের সঙ্গেই বলছি—'দেবী'র বৈধব্য অনিবার্য।'

সভাপতির ভাষণ শুনে সকলেই নীরব হয়ে রইলেন। এমন সময় মহারাজা দাদাঠাকুরকে চুপি চুপি বললেন—'পণ্ডিত মশাই, অমৃতলালবাবু খুব বললেন।'

দাদাঠাকুরও চুপি চুপিই মহারাজাকে বললেন, 'মহারাজ, এর জবাব দেওয়া যায়, কিন্তু উচিত নয়, কারণ উনি সভাপতি।'

মহারাজা—'এই সভায় সভাপতিত্ব করতে এসেছেন উনি, আর আমি হচ্ছি এর স্থায়ী সভাপতি।'—এই কথার পরই মহারাজা উঠে দাঁড়ালেন এবং অমৃতলালবাবুকে জানালেন যে, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তাঁর এই ভাষণের প্রতিবাদ করে জবাব দেবেন।

দাদাঠাকুর খুবই অপ্রস্তুত, কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নির্ভীক অমৃতলাল তখন টেবিলের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কে জবাব দেবে বাবা?'

দাদাঠাকুর—'আপনি ঠিকই বলেছেন, গিরিশবাবু, নীলকণ্ঠ এবং আরও অনেকেই সাহিত্য দেবীর সেবা-পূজা আন্তরিকভাবে করেও বরমাল্য পান নি। আজ সাহিত্য দেবী নিজের ভুল বিবেচনা করে, বিলম্বে হলেও, বরমাল্য দিয়ে আপনাকে পতিত্বে বরণ করেছেন। আপনার পিতা যদি সত্য হন, মাতা যদি সত্য হন, তাঁরা আপনার নাম রেখেছেন 'অ-মৃ-ত'!—বৈধব্য হতে পারে না সাহিত্য দেবীর।'

এতে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে অমৃতলালবাবু প্রশ্ন করেন—'ব্রাহ্মণ বোধ হয় ?'

দাদাঠাকুর—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দৃপ্তকণ্ঠে অমৃতলালবাবু সভার সর্বজন সমক্ষে বললেন—'অমৃত বোস কখনো অপমান পকেটে করে বাড়ি ফেরেনি, আজ তুমি বাপ তুলেছো আমায়—একঘাট লোকের সামনে, কিন্তু আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।—দে বাবা, পায়ের ধুলো।'

প্রায় আশী বৎসর বয়স তখন অমৃতলালের, আর দাদাঠাকুরের বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর। হর্ষধ্বনিতে সমস্ত সভা মুখরিত হয়ে উঠল। আনন্দে আকুল হলেন মহারাজা বিজয়চাঁদ। সভামঞ্চ থেকে অমৃত-লালবাবুকে নিয়ে তখন মহারাজা বিজয়চাঁদ এবং অন্যান্যরা একে একে নামলেন। সর্বশেষে মঞ্চত্যাগ করার মুহূর্তে দাদাঠাকুর অনুভব করলেন—কে যেন তাঁর দুটি পা ধরে আছেন মঞ্চের নীচে দাঁড়িয়ে। দাদাঠাকুর দেখেন এক ভদ্রলোক তাঁর পা দুটি ধরে বলছেন—'আমাকে আপনি ক্ষমা না করলে পা আপনার ছাড়াবো না।'

বিস্মিত হয়ে দাদাঠাকুর বললেন—'আপনি কে ?—কি করেছেন যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন ?'

তখন ভদ্রলোকটি লজ্জিত হয়ে জানালেন—'রাইটার্স বিল্ডিং-এর ধারে তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করেছিলাম অল্প দামে 'বিদূষক' কেনার সময়ে। আপনার পরিচয় না জেনে 'তুমি' বলে সম্বোধনও করেছিলাম—সাধারণ একজন ফেরিওলা মনে করে। আপনি বলেছিলেন—আমার একশো পঁচিশ টাকা মাইনেতে পাঁচজন কর্মচারী পাওয়া যাবে—কথাটা মনে পড়ছে আপনার ?'

দাদাঠাকুর একটু হেসে উত্তরে বলেন—'ফেরিওলাকে সকলেই তো 'তুমি' বলে—এর জন্যে দুঃখ বা লজ্জার কি আছে।'

দাদাঠাকুর বলতেন 'সেই ভদ্রলোকটি ছিলেন সত্যিকারের সাহিত্য রসিক'।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে বৌবাজারে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়িতে দাদাঠাকুর গিয়েছেন জেলেপাড়ার সঙ দেখতে। জেলেপাড়ার সঙ শোভাযাত্রার উৎসাহীরা অমৃতলাল বসু মহাশয়কে দিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক রসের ছড়া-গান বাঁধিয়ে নিতেন। সেই কারণে অমৃতলাল-বাবুও জেলেপাড়ার সঙ-শোভাযাত্রা দেখার জন্য নির্মলবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন। বড় রাস্তার ধারের বড় বারান্দায় দাদাঠাকুরকে দেখে নির্মলবাবুকে ডেকে বললেন—'ভোম্বল (নির্মলবাবুর ডাক নাম), একে চেনো ?'

নির্মলবাবু হেসে বললেন—'দাদাঠাকুরকে চিনবো না !'

তখন অমৃতলালবাবু বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন 'ভোম্বল, তুমি ওকে মোটেই চেনো না। ব্যাটা কোন্ জঙ্গল থেকে এলো, এক ঘাট লোকের সামনে আমায় বাপ তুললে !—কিন্তু আমি কোন জবাব দিতে পারিনি।'

ক্রমশঃ দুজনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেলো। রসিক অমৃতলালবাবুর আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা দাদাঠাকুরকেও মুগ্ধ করলো। অমৃতলালবাবু পরে দাদাঠাকুরকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন।

একদিন সকালে স্টার থিয়েটারের সামনে অমৃতলালবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দাদাঠাকুর 'বিদূষক' ফিরি করে চলেছেন সেই পথ দিয়ে। অমৃতলালবাবু হাঁক দিলেন,—'এই বিদূষকওলা, একটা 'বিদূষক' দে তো বাবা।'

একখানি কাগজ দাদাঠাকুর অমৃতলালবাবুকে দিলেন। কাগজখানি হাতে নিয়ে অমৃতলালবাবু থিয়েটার সংলগ্ন পানের দোকানদারকে বললেন—'একটা টাকা দে তো বাবা, ওবেলা ফেরত দেবো।'

পানওলার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাদাঠাকুরকে 'বিদূষকে'র দাম দিলেন, কিন্তু টাকাটি হাতে না নিয়েই তিনি বললেন—'তেষট্টি পয়সা (তখন এক টাকায় ছিল চৌষট্টি পয়সা) তো খুচরো নেই আমার কাছে, কাগজটা আপনি রাখুন।'

অমৃতলালবাবু বললেন—'তোর কাগজের দাম আমার কাছে এক টাকা।'

দাদাঠাকুর বললেন—'এ বাহাদুরী কেন, আপনার তো আয়রণ-চেস্ট নেই?'

অমৃতলালবাবু—'কে বললে আয়রণচেস্ট নেই, দুটো আছে—একটা থিয়েটারে আর একটা বাড়িতে।'

দাদাঠাকুর—'ও দুটোকে আয়রণ-সেফ্ বলে। যার মা, বাবা, অবিবাহিত ভগ্নী, বিধবা ভগ্নী, অনাথ ভাগ্নে, কনিষ্ঠ ভাই—দু'বেলা খেতে পায় না, পরনের কিছুই জোটে না, সব জেনে শুনে দেখেও যে ভ্রূক্ষেপ করে না, যথেষ্ট স্বচ্ছল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও—তারই আছে আয়রণচেস্ট। আপনার সে আয়রণচেস্ট নেই।'—এই বলে তিনি অমৃতলালবাবুর বুকের উপর হাত রাখলেন।

অমৃতলালবাবুর চোখ তখন অশ্রুসিক্ত, কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন—'আমার আয়রণচেস্ট নেই, বাবা, তোর এই আয়রণচেস্ট কথাটা আমার লেখায় ব্যবহার করার অনুমতি দিবি?'

দাদাঠাকুর বললেন—'হ্যাঁ, দিলাম।'

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে একদিন দুপুরে 'বিদূষক' ফিরি করছেন দাদাঠাকুর। দেখতে পেলেন এক অবাঙালী দম্পতি হিন্দী গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। সে যুগে এটা প্রায়ই দেখা যেতো। অতি মিষ্টি সুরে গান গাইতো তারা এবং তাদের নিজস্ব এক ভাবধারাও ছিল। আকৃষ্ট হলেন দাদাঠাকুর। সেই ভিখারী দম্পতির সঙ্গে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত পিছু পিছু চললেন, এতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তাঁর। সমস্ত গানটি শুনতে শুনতে সেই গানের ভাষা ও সুর তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নিলেন। ওদের গাওয়া

সেই হিন্দী গানটি দাদাঠাকুর প্রায়ই গেয়ে শোনাতেন এবং বলতেন—'কি অপূর্ব সুন্দর ভাষা আর অর্থ এই গানটির!'

গানটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, আশা করছি পাঠক-পাঠিকাদেরও ভালো লাগবে।

'আরে সাথিয়া শোন্—মেরী লালা
আখের মাট্টিসে মিল যানা।
হাড় জ্বলেগা লক্‌ড়ী যেইসা কেশ য়ো ঘাস
লাখ টাকা কা জান যাগা জঙ্গল হোগা বাস।
দেশ দেশ কা বৈদ বোলায়া, বোলায়া জড়জ[১] বটী[২]
জড়জ বটী কুছ্ আঙ[৩] নাই লাগে, ঠাকুর ঘর গিয়া টুটি।
কাঁহা মিলেগা মাণক মোতি, কাঁহা মিলেগা দরজী
অন্তর ঝুলি টুট্ গিয়া তো, কৌন্ সিয়েগা দরজী।
মায়া কিয়া হ্যায় সোমকুবের, না খর্‌চে না খায়,
রত্তি রত্তি জমা করে, বাঁধে যম নে যায়।
কৌড়ি কৌড়ি মায়া জড়ি, রূপেয়া লাখ ক্রোড়,
ভগবৎ ঘর সে চিঠি আয়া তো, তব্ লে যায়া ছোড়্।
দিয়া লিয়া তেরী সঙ্ চলেগা, দাতা রহেগা নাম,
পঞ্জর ছোড়কে প্রাণ চলেগা, মুর্দা[৪] চলে মশান।
ঘরকা বিচ মে বাগান বানায়া, রিচা[৫] কমল কা ফুল,
দো চার ঘড়ি দেখ লে না তো, আখের মাট্টি ধূল।
মায়ী রোয়েগী জনম ভর, লেড়কা রোয়েগা মাস,
ঘরকা স্তিরিয়া[৬] তিন দিন রোয়ে ঢুঁড়ে[৭] দুসর কে আশ।

১। জড়জ—শিকড়, ২। বটী—বটীকা এবং ৩। আঙ্—অঙ্গ।
৪। মুর্দা—মৃতদেহ, ৫। রিচা—রচনা করিয়াছে, ৬। স্তিরিয়া—স্ত্রী এবং
৭। ঢুঁড়ে—খোঁজে।

একদিন দুপুরে এক গলির মধ্যে 'বিদূষক' ফিরি করছেন, একটি যুবতী মহিলা দাদাঠাকুরকে ডাকলো বিদূষক কিনবার জন্যে। এমন সময় দাদাঠাকুরের কর্ণগোচর হোলো সেই বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহিণীর দৃঢ় কণ্ঠ। তিনি যুবতীটিকে নিষেধ করলেন—'সাবধান বৌমা, কাগজ ফিরি করবার অছিলায় এসে ওরা ঘট্‌টে-বাট্‌টে নিয়ে সরে পড়বে।'

আর এক সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটা বাড়ির একজন মহিলা দাদাঠাকুরকে ডেকে বললেন—'একখানা বিদূষক কিনবো, আমার কাছে একটা টাকা রয়েছে, খুচরো পয়সা তোমার কাছে আছে?'

দাদাঠাকুর—'মা, আমি খুচরো তেষট্টি পয়সা দিতে পারি।' একখানি বিদূষক মহিলাটিকে দিয়ে দাদাঠাকুর সংলগ্ন একটি বাড়ির রোয়াকে খুচরো পয়সা গুনে গুনে সাজিয়ে রাখলেন এবং মহিলাটি ফেরত পয়সা গুনে নিলেন। এদের অগোচরে এক যুবক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। মহিলাটি পয়সা গুনে নেবার পর যুবকটি এগিয়ে এসে দাদাঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—'বৌমাকে তো কাগজ বিক্রি করলেন, দেখলাম; কিন্তু আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো না দিয়ে যেতে পারবেন না।'

মহিলাটি স্বামীকে ফিরিওলার পায়ের ধুলো নিতে দেখে বিস্মিত হলেন এবং ফিরিওলাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করার জন্য খুবই লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালেন। দাদাঠাকুরের লক্ষ্য এড়ায়নি, তিনি মহিলাটিকে বললেন—'মা, লজ্জা পাচ্ছো কেন?—তোমার কিছু ত্রুটি হয় নি।'

দাদাঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে যুবকটি বললেন—'আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য, দাদাঠাকুর আমাদের বাড়িতে এসেছেন।' মহিলাটি দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললেন—'আপনি আসুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

দাদাঠাকুরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জলযোগ করিয়ে তাঁরা খুবই তৃপ্তি লাভ করলেন। ভদ্রমহিলাটি নিয়মিত 'বিদূষক' পড়তেন ; সেদিন পরিচয় পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন এবং ধন্য বোধ করলেন।

আর একদিনের কথা। সেদিন দুপুরে 'বিদূষক' ফিরি করছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, এমন সময় দেখলেন বলিষ্ঠ এক যুবক দু'তিন বছরের একটি শিশুকে কোলে নিয়ে পথচারীদেব কাছে ভিক্ষা করছে। যুবকটি দাদাঠাকুরের কাছেও এলো তার ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে। যুবকটিকে দাদাঠাকুর প্রশ্ন করেন সে কোন কাজ-কর্ম কেন করে না। উত্তরে অতি বিনীতভাবে যুবকটি বলে—তার স্ত্রী এই শিশুটিকে রেখে মারা গেছে অল্প কিছুদিন আগে। এমন আপনজন বলতে তার আর কেউ নেই, যার কাছে এই শিশুটিকে রেখে সে কোন কাজে যেতে পারে। এই সব কারণেই তাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে।

দাদাঠাকুর তাকে চারটি পয়সা দিলেন, মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন ঐ লোকটির দুরবস্থার কথা শুনে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সন্দেহ জাগলো তাঁর মনে। ভাবলেন—অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোকই তো এইভাবে ঠকিয়ে বেড়ায় অনেককেই। যাই হোক, একটু দূরে সরে গিয়ে তিনি আপন কর্মে মন দিলেন, কিন্তু নজর রাখলেন যুবকটির ওপর।

দিনের শেষে সেই যুবকটি বেলা প্রায় পাঁচটার সময় বেশ জোরে হেঁটে চললো মেডিক্যাল কলেজের দিকে। দাদাঠাকুরও চললেন যুবকটির পিছু পিছু—একটু তফাত রেখে। আরপুলি লেন দিয়ে গিয়ে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এসে ওখানে একটি বাড়ির রোয়াকে বসে-থাকা এক যুবতীর কোলে শিশুটিকে নামিয়ে দিলো, তারপর কিছু পয়সা মেয়েটির হাতে দিয়ে সেই যুবকটি একটি বিড়ি ধরিয়ে বেশ আরাম সহকারে টানতে টানতে চলে গেল সেখান থেকে।

যুবকটি চলে যাবার পর দাদাঠাকুর মেয়েটির কাছে গেলেন এবং

প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, যুবকটি যে শিশুটিকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করছিল সেই শিশুটির মা ঐ যুবতী। অতি অসহায়ভাবে যুবতীটি দাদাঠাকুরকে জানালে—'লোকটি পাড়ার গুণ্ডা, অতি অসৎ চরিত্র; ছেলেটাকে ওর হাতে ছেড়ে না দিলে মেরে ফেলার ভয় দেখায়, রোজই দুপুরবেলায় নিয়ে যায় আর এমন সময়টাতে ফেরত দিয়ে যায়; তার জন্যে চার আনা করে পয়সা দেয় আমাকে। ছেলেটার জীবনের ভয়ে আমি ওর হাতে তুলে দিই, কিন্তু যতক্ষণ না কোলে ফিরে পাই ততক্ষণ খুবই দুশ্চিন্তায় কাটে আমার।'

দাদাঠাকুর এই এক করুণ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে বালক প্রদ্যোৎকুমার রায় দাদাঠাকুরকে দেখতে যান। প্রদ্যোৎকুমার বাগমারীর বাড়ির মালিক ভোলানাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলিনী রায়ের একমাত্র সন্তান। প্রদ্যোৎকুমারের বাড়ি যশোর জেলার নড়াইল। এঁরা নড়াইল-এর জমিদার ছিলেন। প্রদ্যোৎকুমারের পিতৃ বিয়োগের পর মাতামহ ভোলানাথবাবু কন্যা এবং দৌহিত্রকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন।

দাদাঠাকুরকে বলতে শুনেছি—'আমি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, একটু স্বস্তিবোধ করে চোখ খুলে দেখি খোকা (প্রদ্যোৎকুমার) কাছে বসে আমার পা দুটি টিপে দিচ্ছে, এতে আমি খুবই আরাম বোধ করেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে আমাকে সাগু খেতে দিলে। শুনলাম খোকা তার নিজের মায়ের কাছ থেকে সাগু চেয়ে এনেছে আমার জন্যে।'

একদিকে দিদিঠাকরুণের চিকিৎসা আর অন্যদিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, তার ওপর রয়েছে 'বিদূষক'-এর যাবতীয় কাজ—লেখা ছাপা এবং বিক্রি—সবই দাদাঠাকুরকে একা করতে হোতো। টাকা পয়সার অসচ্ছলতার জন্যে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হলেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি কখনও করেন নি।

এই সময়ে কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গেলে বাড়ির মালিক ভোলানাথবাবু দাদাঠাকুরকে ডেকে সমস্ত বাকি ভাড়া এক সঙ্গে মিটিয়ে দিতে বললেন। এতে দাদাঠাকুর বেশ বিব্রত হলেন বটে, কিন্তু তিনি এর জন্য অল্প ক'দিনের সময় চাইলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ভোলানাথবাবুর দারোয়ান দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে বাকি ভাড়ার সমস্ত রসিদ দিয়ে জানালো যে, বড় দিদিমণি (কমলিনী রায়) এই রসিদগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দারোয়ান চলে যাবার পর দাদাঠাকুর কমলিনী রায়ের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলেন যে, মিত্র মহাশয়কে না জানিয়েই তিনি দাদাঠাকুরের বাকি টাকা মিটিয়ে রসিদগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। দাদাঠাকুরের সেদিনের অবস্থার কথা কমলিনী নিজে উপলব্ধি করেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে এক সময় দাদাঠাকুর কমলিনীর সমস্ত টাকা পরিশোধ করেছিলেন এবং সহৃদয়া এই বড় দিদিমণির কোমলতার কথা সারা জীবন তিনি মনে রেখেছিলেন। দাদাঠাকুর বলতেন—'ওঁরা বনেদি বড়োলোক, এখনকার মতো পয়সাওলা ধনী নয়, অবস্থা পড়ে গেলেও ওঁদের মন ঠিক উঁচুতেই ধরে রাখা আছে।'

এক রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়ে দাদাঠাকুর হেঁটে ফিরছেন প্রায় বারোটার সময়। মানিকতলা ব্রীজের কাছে টহলদার পাহারাওলা দাদাঠাকুরকে ডাকলো—'এই, ঠ্যারো, এতনা রাতমে কাঁহা যাতা হ্যায় ?'

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে যে রাত হয়ে গেছে সেই সত্য কথাটা

দাদাঠাকুর পাহারাওলাকে জানালেন। পাহারাওলা কিন্তু বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বললে—'হ্যাঁ, এতনা রাত মে সব নিমন্ত্রণ খাতা হ্যায়, চলো থানামে নিমন্ত্রণ খায়গা।'

কিছু 'বিদূষক' কাগজ ছিল দাদাঠাকুরের কাছে। রাতও হয়েছে, এর ওপর পাহারাওলার জুলুম। যাক্, উপায় যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন থানাতেই যেতে হবে। পাহারাওলার সঙ্গে অল্প পথ হেঁটেই তাকে প্রশ্ন করলেন দাদাঠাকুর—'সিপাই জী, আপকো একঠো বাৎ পুছেঙ্গে, আপ ব্রাহ্মণ ইয়া ছত্রী?'

সিপাইটি আরও গম্ভীর হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে—'এই বাৎ কাহে কো পুছতে হেঁ, বোলো?'

দাদাঠাকুর বললেন—'একঠো বাৎ মেরা মনমে হোতা, উসি লিয়ে পুছতা।'

সিপাই—'হাম ছত্রী হ্যায়, কেয়া তুমরা মনমে হোতা বোলো?'

দাদাঠাকুর—'ঠিকই হুয়া সিপাইজী, এই হিন্দুস্থানকে রাজা থে ছত্রী; আওর ওহি ছত্রী রাজা ব্রাহ্মণকো পূজা করতে থে।—আজ ছত্রী হুয়া সিপাই আউর ব্রাহ্মণকো বিনা কসুরসে পাকড়াকে লে যাতা থানা, এহি হাল হুয়া হিন্দুস্থানকা।'

সিপাইটি নিজেকে রাজার জাত মনে করে গর্বিত বোধ করলো এবং পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললো—'তুম ঘর চলা যাও।'

দাদাঠাকুর বলতেন—'ভাই, ঐ সময় ঐ বুদ্ধি কাজে না লাগাতে পারলে সে রাতে চোর-বদমাস এবং নানা ধরনের হাজতবাসীর সঙ্গে আমাকে রাত কাটাতে হতো।'

বাগমারীতে বাসা ভাড়া করা এবং ওখান থেকে 'বিদূষক'-এর প্রকাশ করবার প্রধান কারণ ছিল অসুস্থ দিদিঠাকরুণের (প্রভাবতী দেবীর) কলকাতায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ

হলে পর দাদাঠাকুর বাগমারীর বাসা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গিপুরে ফিরে যান। এরপর কার্যোপলক্ষে কলকাতায় এলে খুলনা জেলার বিশিষ্ট বিপ্লবী কানাইলাল চক্রবর্তীর ১৩০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণি) এক বাড়ির তিন তলার ঘরে বাস করতেন। কানাইবাবুর বাসায় থাকাকালীন আলাপ আলোচনার কথা প্রায়ই দাদাঠাকুর গল্পচ্ছলে বলতেন, তারই কিছু সংক্ষেপে নিবেদন করছি—

শ্যামবাজারে কানাইবাবুর বাসায় থাকার সময় একদিন সকালে স্বনামধন্যা দেশসেবিকা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এসে দেখেন দাদাঠাকুর কি যেন মাখছেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী ভেবেছেন আটা মেখে দাদাঠাকুর রুটি তৈরি করবেন। কিন্তু দাদাঠাকুরকে তা-ই খেতে দেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, 'কাঁচা আটা খাবেন না, অসুখ করবে।' দাদাঠাকুর জানালেন—তাঁর অভ্যাস আছে অতএব কিছু হবে না। পরের দিন জ্যোতির্ময়ী দেবী দাদাঠাকুর কেমন আছেন দেখতে এলেন। দাদাঠাকুর জানালেন ভালই আছেন, আটা নয় ছাতু খাচ্ছিলেন।

সেই বাসায় যখন কানাইবাবু গুপ্তভাবে বিপ্লবীর কাজ করতেন তখন তিনি নিরীহভাবে থাকতেন আর ঐ বাসায় সুগন্ধি তেল; সেণ্ট তৈরি করে বিক্রি করতেন। দাদাঠাকুর বলতেন—মাঝে মাঝে পুলিশ হানা দিতো কিন্তু কানাইবাবু দাদাঠাকুরকে কোন রকম হয়রানি হতে দিতেন না। কানাইবাবু পুলিশের বড় অফিসারকেও গ্রাহ্য করতেন না।

কানাইবাবু নিজেই রান্না করতেন ডাল ভাত, তা দাদাঠাকুরের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। খুবই অসুবিধার মধ্যে কানাইবাবুকে দিন চালাতে হতো। একদিন তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন, 'দাদা, তুমি অন্যত্র ব্যবস্থা দেখ, আমি তোমাকে আর খাওয়াতে পারবো না।'

দাদাঠাকুর যেমন নিয়মিত ভাতের আসনে বসেন একটা পাত্র নিয়ে সেইভাবেই খেতে বসলেন। কানাইবাবু কিছু বলেন নি। ডাল মুখে দিয়ে দাদাঠাকুর দেখলেন আলুনি, বুঝলেন কানাইবাবু ইচ্ছে

করে নুন দেয়নি অথচ দিব্যি খাচ্ছে। কানাইবাবুর ডালের বাটির তলায় নুন দেওয়া ছিল। পরের দিন এক পয়সার নুন কিনে নিয়ে দাদাঠাকুর খেতে বসলেন। তাই দেখে কানাইবাবু বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি আমি আর খাওয়াতে পারবো না।'

দাদাঠাকুর প্রশ্ন করলেন, 'তুই কি আমাকে খাওয়াস?'

কানাইবাবু প্রতি প্রশ্ন করলেন—'তবে কে খাওয়ায়?'

জবাবে দাদাঠাকুর বললেন, 'মুদি তোকেও খাওয়ায়—আমাকেও খাওয়ায়, তুইও পয়সা দিস না আমিও দিই না।'

কানাইবাবু নিরুত্তর।

আর একদিন কানাইবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন, 'দাদা, খাঁটী ঘি কিনে দিতে পারো?'

দাদাঠাকুর বললেন 'পারি।'

কানাইবাবু—'টেস্ট করবে কি করে?'

দাদাঠাকুর—'চল্ আমার সঙ্গে টেস্ট করে কিনে দেবো, কোন ল্যাবরেটরির দরকার নেই।' এরপর দুজনে গেলেন সকালবেলায় এক মাড়োয়ারীর দোকানে। খাঁটী ঘি, একটা টিন থেকে নমুনা দেখালেন দোকানদার, সব থেকে দামী এবং খাঁটী ঘি বলে বড়াই করলেন। দাদাঠাকুর দোকানদারকে অনুরোধ করে বললেন, 'আপ থোড়া মেহেরবাণী করকে খাইয়ে।'

মাড়োয়ারীটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'ক্যা ঝামেলা কা আদমি আপ, আভি পূজা নেহি হুয়া, মুখ মে দেগা নেহি।'

দাদাঠাকুর—'আপ পূজা হোনে কা বাদ খাইয়ে, হাম বইঠতা।'

রাগান্বিত হয়ে মাড়োয়ারীটি জানালেন—তিনি দাদাঠাকুরকে ঘি বিক্রী করবেন না। তখন দোকান থেকে বেরিয়ে কানাইবাবুকে দাদাঠাকুর বললেন, 'চর্বি মেশানো ঘি মুখে ও ছোঁয়াবে না।'

অবাক হয়ে কানাইবাবু বললেন—'দাদা, কোনো ল্যাবরেটারির ক্ষমতা নেই যে, এইভাবে পরীক্ষা করে।'

নির্ভীক বিপ্লবী কানাইবাবুর অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে এক শীতের সন্ধ্যায় পাকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় কানাইবাবুর খবর জানতে চাইলেন দাদাঠাকুরের কাছে আমাদের বাড়িতে এসে। দাদাঠাকুর জানালেন, হয়ত কানাইবাবু সন্ন্যাস নিয়ে কোথাও আছেন। পরে দাদাঠাকুরের মুখে শুনেছি—কুমার অরুণচন্দ্র কানাইবাবু এবং অন্যান্য বহু বিপ্লবীকে বৈপ্লবিক কাজে গোপনে মুক্ত হস্তে বহু অর্থ দিয়েছেন। অমলবাবু কুমার অরুণচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আপনি নিজে পুলিশের নজর এড়ালেন কি করে ?'

কুমার অরুণচন্দ্র হেসে বললেন—'আমি ক্যালকাটা ক্লাবে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতাম তাই আমাকে কখনও পুলিশ সন্দেহ করেনি।' কুমার অরুণচন্দ্র দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, 'শীতের সময় খালি গায়ে খালি পায়ে কষ্ট হয়না ?' উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'জানু, ভানু, কৃশানু—অর্থাৎ শীতের দিনে দু'হাতে হাঁটু বুকে জড়িয়ে বসা তারপর রোদে বসা এবং পরে সন্ধ্যায় আগুন পোয়ানো।'

দিদিঠাকরুণের কথা প্রসঙ্গে একদিন দাদাঠাকুর বললেন—'ভাই, ব্রাহ্মণীর পায়ে ফাইলেরিয়া ব্যাধি হলো, অনেক চিকিৎসাও হলো। ডাক্তাররা বললেন—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। আমি ব্রাহ্মণীকে পাল্কিতে চড়িয়ে কয়েক মাইল রাস্তা পাশে পাশে হেঁটে এসে রেলগাড়ীতে চড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে এলাম। তোদের দিদিঠাকরুণকে বললাম—'তুমি যদি হাকিম বা জজের গিন্নী হতে তাহলে তোমাকে পাল্কিতে চড়িয়ে চাপরাসি সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিতো, আমি নিজে পাশে পাশে হেঁটে এলাম।'

প্রসঙ্গতঃ জানাচ্ছি, কলকাতায় এসে পাছে হাওড়া স্টেশনে অসুবিধা হয় সেই জন্য বিশেষ পরিচিত কয়েকজনকে উপস্থিত থাকার

জন্য দাদাঠাকুর চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। একমাত্র দাদাঠাকুরের অনুগত পরম স্নেহভাজন বিপ্লবী শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় হাওড়া স্টেশনে একটি ইনভ্যালিড চেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। দাদাঠাকুর বিভূতিদার সেদিনের কথা কখনো ভোলেন নি।

এক সময় জমির উঁচু আলের উপর থেকে পড়ে গিয়ে বিভূতিদার কোমরের হাড় ভেঙে যায়, খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। বাঁকুড়াতে দাদাঠাকুরের সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম। সেই সময় দাদাঠাকুরের মেয়ে শ্রীমতী বিন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পি. জি. হাসপাতালে পেয়িং বেডে ভর্তি করেছিলেন দাদাঠাকুর। কিছুদিনের মধ্যে বিভূতিদাকেও বাঁকুড়া থেকে আনিয়ে পি. জি হাসপাতালে ভর্তি করলেন। দুটি রোগীর সমস্ত চিকিৎসার খরচ বহন করলেন দাদাঠাকুর একা। বিভূতিদাও দেবতুল্য মানুষ, তিনিও দাদাঠাকুরের ঘরের মানুষ হয়েই ছিলেন।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আন্দামান দ্বীপের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে ফিরে আসার পর দাদাঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং শেষ দিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল। উপেনবাবুকে 'উপেনদা' বলে সম্বোধন করতেন তিনি আর উপেনবাবু দাদাঠাকুরকে 'দাদা' বলতেন।

উপেনবাবু একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ হবার পরদিনই দাদাঠাকুর সেই পত্রিকার কার্যালয়ে উপস্থিত হলেন। উপেনবাবু এবং আরও কয়েকজন সেখানে বসেছিলেন। দেখে দাদাঠাকুরের মনে হলো—ওঁরা সকলেই যেন বিশেষ চিন্তিত। দাদাঠাকুর বললেন—'উপেনদা, তোমার পত্রিকাটি আমার বড়ো ভালো লাগলো।'

উপেনবাবু তদানীন্তন একখানি বিখ্যাত পত্রিকা, নাম 'নায়ক', দাদাঠাকুরকে দিয়ে বললেন—'এই দেখ।'

দাদাঠাকুর বললেন—'এ তো 'নায়ক' !'

উপেনবাবু—'তাই তো দিলাম তোমাকে।' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন 'নায়ক'-এর সম্পাদক। 'নায়ক'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাঁচকড়িবাবু উপেনবাবুর নব প্রকাশিত পত্রিকাটিকে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন—'স্বদেশের অর্থ জানে না আঁতুড়ে-খোকা, স্বদেশের কথা লিখে কাগজ চালাবার ধৃষ্টতা দেখে বিস্মিত হলাম…ইত্যাদি।'

উপেনবাবু বললেন—'দাদা, পাঁচকড়িদা যদি এইভাবে গোড়া থেকেই পিছনে লেগে গালাগালি দিতে শুরু করেন তাহলে কী উপায় ?'

দাদাঠাকুর—'ভয় পেলে কি চলে ? কাগজ যদি চালাতে হয় তাহলে জবাব দাও।'

উপেনবাবু নিজের দুর্বলতা জানিয়ে বললেন—'কি লিখবো ভেবে পাচ্ছি না। দাদা, তুমি যদি এর জবাব লিখে দাও তো কৃতার্থ হই।'

দাদাঠাকুর—'তুমি তো জানো উপেনদা, নিজের কাঁসি নিজে বাজাই আমি, পরের ঢাকে কখনও কাঠি দিই না।'

উপেনবাবু—'উপায় কি বলো তাহলে ?'

দাদাঠাকুর উপেনবাবুর বিপন্ন অবস্থা দেখে বললেন—'তুমি লেখো, আমি বলি।'

হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলেন উপেনবাবু। তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন আর পাশের একজনকে বললেন—'ওরে, দাদাকে তামাক দে।'

দাদাঠাকুর হুঁকো ধরিয়ে বলতে শুরু করলেন :

'সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার অসাবধানতার জন্য আমি দুঃখিত। নবজাত শিশু যখন আঁতুড় ঘরে থাকে তখন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আঁতুড় ঘরের দোরগোড়ায় ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাঁটা আর ছেঁড়া জুতো রাখা বিধি। অন্যথায় আঁতুড়ে নবজাত শিশুর সমূহ বিপদের

আশঙ্কা থাকে। এই জিনিসগুলো আঁতুড়ঘরের দোরগোড়ায় রাখলে নবজাত শিশুকে 'পেঁচোয়' পায় না। ভবিষ্যতে সাবধান হবেন। এই ভুল যেন আর না হয়। ইতি—

বৃদ্ধা ধাত্রী।'

উপেনবাবু লেখা শেষ করে কাগজ-কলম ফেলে লাফিয়ে উঠে দাদাঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'দাদা, এ বুদ্ধি কি সোজা বুদ্ধি!—পায়ের ধুলো দাও।'

পরের দিন উপেনবাবুর কাগজে সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি ছাপা হলো। এদিকে পরের দিনই দাদাঠাকুর 'নায়ক' পত্রিকার কার্যালয়ে গেলেন পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দাদাঠাকুরকে দেখে পাঁচকড়িবাবু বললেন—'এসো বাঁদর।'

'তুমি আমাকে বাঁদর বললে কেন!' দাদাঠাকুর ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন।

পাঁচকড়িবাবু—'এ তোমার কাজ, উপেনের ঘটে এ বুদ্ধি নেই। এখানে এসেছো মজা দেখতে।'

সিঁথির বাড়িতে একদিন দেখা করতে গেলে উপেনবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন—'দাদা এসেছো, একটু চা খাবে তো?'

দাদাঠাকুর—'উপেনদা, আমি চা খাবো না।'

উপেনবাবু—'চা খাবে না তো আমি সিঁথিতে তোমাকে কি দেবো?'

দাদাঠাকুর নিজের মাথাটিকে উপেনবাবুর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'সিঁদুর।'

উপেনবাবু হেসে বললেন—'এই জন্যেই তো বলি তুমি এসো, তাহলে আমার আয়ু বৃদ্ধি পাবে।'

বিপ্লবী দলের বহুলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল দাদাঠাকুরের। তিনি নিজেও গোপনে গোপনে বিপ্লবীদের অনেক কাজ করে দিতেন। গল্পচ্ছলে বলতেন—'যখন স্কুলে পড়ি তখন স্টীমার ঘাটের একজন কর্মচারী আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রতি সপ্তাহে বিপ্লবীদলের খবরের কাগজ লুকিয়ে বিলি করবার জন্যে দিতেন অতি সঙ্গোপনে। কলকাতা থেকে স্টীমারের সারেঙের মারফত সেই কাগজ স্টীমার ঘাটের কর্মচারীর হাতে পৌছাত। সেই কাগজ আমি গোপনে সন্ধ্যার বা রাত্রের অন্ধকারে বড় বড় উকিল, উচ্চ রাজকর্মচারী এবং জ্ঞানীগুণী বিশিষ্ট ভদ্রলোকেদের বাড়িতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে আসতাম।

এক সন্ধ্যার অন্ধকারে একজন সম্মানী মুসলমান উকিলের বাড়িতে কাগজ ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই উকিল ভদ্রলোক পিছন থেকে আমাকে ধরে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, ভয়ে গলা কাঁপছে। উকিল ভদ্রলোকের ছেলে কাদের মিঞা আমার সহপাঠী ছিল। ভয়ে ভয়েই বললাম—'আমি কাদেরের সঙ্গে পড়ি, আর করবো না।'

উকিল ভদ্রলোক বললেন—'আমাকে দুটো করে কাগজ দিতে হবে, আমিও কাউকে বলবো না।'

হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না তাই দাদাঠাকুরের জীবনের দুটি অতি মূল্যবান আদর্শের কথা উল্লেখ করছি। একটি—নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা এবং অপরটি—সব কাজে সাবধান হয়ে, সোজা পথে পা ফেলে চলা।

যেমন—স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষার পূর্বেই স্কুলে পৌছে দিতেন নিয়মমতোই। কিন্তু প্রবল বর্ষার জন্য একবার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে, স্থান বিশেষে জমে থাকা বর্ষার জল সাঁতরে তিনি অতি যত্ন সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে ছাপানো প্রশ্নপত্রাদি পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

ছাপাখানার কাজে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে খাবার সময়টুকুও তাঁর ভাগ্যে অনেক সময়েই জুটতো না। শুধু তাই নয়, হাতে কালি লেগে থাকার জন্য খেতেও পারতেন না সময় সময়। সেজন্য মেয়েরা ছাতু-গুড় ইত্যাদি গুলে সরবত করে খাওয়াতেন দিনের পর দিন। ফলে দাদাঠাকুরের হাতে এক রকমের যন্ত্রণার উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই যন্ত্রণায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন।

একদিন দাদাঠাকুর তাঁর স্নেহধন্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ রায়কে যন্ত্রণার কথা বলেন। ডাক্তার রায় বি-আই-এস-এন্ কোম্পানীর নিযুক্ত একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক।

খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর ডাক্তারবাবু গ্লুকোজ খাবার কথা বললেন দাদাঠাকুরকে। তারপর একটু চিন্তা করে ডাঃ রায় দাদাঠাকুরকে একথাও বলেছিলেন যে, যতটা বেশি সম্ভব গুড়ের তৈরি বাতাসা খাবেন—এতেও যথেষ্ট উপকার হবে।

তাই সে কারণেই দাদাঠাকুরের কাপড়ের খুঁটে বাতাসার ঠোঙা বাঁধা থাকতো প্রায় সব সময়েই। নিজে তো খেতেনই, তাছাড়া অনেককেই খাওয়াতেন, বলতেন—'খুবই আরাম পেয়েছি ভাই, ভূপেনের বাতাসা প্রেসক্রিপশনে। বেচারা ভূপেন পরের উপকার অন্তর দিয়েই করে বটে কিন্তু সে নিজের মাথার ওপর পৃথিবীর সব যন্ত্রণার বোঝা নিয়ে দিন কাটায়!—তাই তো ওর নাম "ভূ-Pain"!—পাণ্ডিত্যও আছে যথেষ্ট।—চাকরি করেও মনে বেশ আনন্দ নিয়েই থাকে ডাক্তারটি।'

রেল স্টেশনে গিয়ে অপরাপর যাত্রীদের মতই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটাই দাদাঠাকুরের অভ্যাস। কিন্তু স্টেশন মাস্টার বা অন্যান্য টিকিট বিক্রেতা বাবুরা দাদাঠাকুরকে প্রায়ই অনুরোধ করতেন টিকিট ঘরের ভিতরে বসে বিশ্রাম করতে। কিন্তু সে অনুরোধ দাদাঠাকুর

ভুলেও কোনদিন রক্ষা করেন নি। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলতেন—'না ভাই, ও ঘরে প্রবেশ করা উচিত হবে না। যদি টিকিট বিক্রির টাকার হিসাবপত্রে কোন গরমিল হয়, স্বাভাবিক কারণেই তখন সন্দেহ হবে আমার ওপরেই। মনে হবে—দাদাঠাকুর ছাড়া আর তো কেউ এ ঘরে ঢোকেনি, অতএব···। কাজেই এ অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা কখনই সম্ভব নয়। আমিও লজ্জিত হব, কিন্তু মুখ খুলতে পারবো না। বুঝতে পারছি—আমার প্রতি তোমাদের এ শ্রদ্ধা—এ ভালোবাসা অপরিসীম, এটাই আমার কাছে খুব আনন্দের।'

রেলের বাবুরা দাদাঠাকুরের যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে নীরব থাকতেন এবং সময় সময় ঘরের বাইরে এসে দাদাঠাকুরের সঙ্গলাভে আনন্দিত হতেন।

কলকাতায় বিদূষক ফিরি করার সময় একদিন পথে দেখা হলো দাদাঠাকুরের সঙ্গে বিখ্যাত সি. কে. সেন কোম্পানীর অংশীদার কবিরাজ সত্যব্রত সেন মহাশয়ের সঙ্গে। সত্যব্রতবাবুর ডাকনাম ছিল 'গদাবাবু'। গদাবাবু নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। গদাবাবু দাদাঠাকুরকে বললেন—'পথেই তোমার সঙ্গে দেখা হলো, আমার দুটো কথা শুনতে হবে।—বাবা, জ্যাঠা, কাকার স্বর্গলাভের পর আমরাই তাঁদের সব সম্পত্তির মালিক হয়েছি।—তুমিও তাঁদেরই সম্পত্তি। তাই বলছি আমাদেরও অধিকার আছে তোমার কাছে জুলুম করার।'

দাদাঠাকুর গদাবাবুর কথা শুনেই বুঝেছেন কিছু মতলব আছে। যাইহোক তিনি বললেন—'কি জুলুম করতে চাও বলো।'

গদাবাবু—'তোমাকে আমাদের কলুটোলার বাড়িতে একত্রে বসবাস করতে হবে, আজই চলো আমার সঙ্গে।'

এড়াতে পারলেন না দাদাঠাকুর গদাবাবুর আন্তরিক ভালো-

বাসার জুলুমকে। এরপর থেকে কার্যোপলক্ষে তিনি যখনই কলকাতা আসতেন, উঠতেন গদাবাবুদের কলুটোলার বাড়িতেই।

এই সময়ে দাদাঠাকুরের এক ছেলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর থেকে ছেলেটির অসুখের কথা জানালেন গদা-বাবুকে। টাইফয়েড রোগে বরফের প্রয়োজন হয়, তাই প্রতিদিন একমণ করে বরফ পাঠাতেন গদাবাবু দাদাঠাকুরের বাড়িতে। দুটি মাস রোগ ভোগ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো ছেলেটি। তাই টেলিগ্রাফ করে বরফ পাঠাতে নিষেধ করলেন তিনি।

অদ্ভুত মানুষ দাদাঠকুর। শ্মশান ঘাটে চোখে জল নেই তাঁর, অন্তরের বেদনা চেপে রেখে শ্মশানের সকলের সঙ্গেই তিনি স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করছেন।

দাদাঠাকুরের অনুরাগী একজন শ্মশান-বন্ধু দাদাঠাকুরের ঐ রকম মনোভাব দেখে প্রশ্ন করলেন—'দাদা, এখন কি আপনার গলায় গান আসে ?'

দাদাঠাকুর হেসে বললেন—'আসে, শুনবি ?'

ওদিকে চিতার ওপরে নিজের ছেলের শবদেহ আর এদিকে হতভাগ্য পিতা গান ধরলেন :

দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি—
তাই ভেবেছ ভগবান !
আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইবো গান।
তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া
আমার এতে কি লোকসান ?
দত্তাপহারী হোলে যে—
নিলে জিনিস কোরে দান !
ভাগ্যে আমার হবে যা—হোক,
হলাম তোমার দুখের গ্রাহক,

তোমার ভাণ্ডারের দুখ কোরে খালি
করবো দুখের অবসান।

দাদাঠাকুরের পরম স্নেহভাজন গদাবাবুর অনুরোধে তাঁর কলুটোলার বাড়িতে বসবাসের সময় একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানা ঘরে আড্ডা বসেছে। কথায় কথায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বৈদ্যদের নানান্ অবদানের কথা উঠল। দাদাঠাকুরও সেই আলোচনায় যোগ দিয়ে অনেক কথার পর হঠাৎ বলে বসলেন—'যাই বল্ গদা, তোরা বৈদ্যরা বড় ছোট নজরের জাত।' শুনে গদাবাবু একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলেন। সে আড্ডায় গদাবাবুর কয়েকজন নিকট আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে দাদাঠাকুরের এই ধরনের মন্তব্য গদাবাবু আশা করেন নি। তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন—'তুমি আমার এখানেই থাকছো, আমাদের সঙ্গে খাচ্ছো আর আমাদের জাতকেই গালাগাল দিচ্ছো!'

উত্তরে সহজভাবেই দাদাঠাকুর বললেন—'বলবো না, সত্যিকথা? তোদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একটা ওষুধ আছে 'শুচিকাভরণ'—সাপের বিষে তৈরি, মাত্রা একটু এদিক-ওদিক হলেই তো দফা শেষ।—রোগী অক্কা পাবে। নজর খুব ছোট না হলে ছুঁচের ডগায় পরিমাণ মতো বিষ—যা সকলের চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বৈদ্যদের সে ছোট-নজর আছে কি না তুই বল্?'

এই উত্তর শুনে আড্ডায় উপস্থিত সকলেই হো হো কোরে হেসে উঠলেন। ঘরের গুমোট আবহাওয়া ঠাণ্ডা হোলো। গদাবাবু বললেন —'না, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না।' দাদাঠাকুর বললেন—এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারও তো দেখলুম! পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছে, দিলে পা কেটে বাদ। ওদিকে বিধাতা ম্যানুফ্যাকচারার পার্টস পাঠাচ্ছেন না। ডাক্তার তাই দিলে কাঠের পা লাগিয়ে। রোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে

বললে—এ আরো ভালো হোলো, চুলকানী হবে না, মশা বসবে না, অন্তিমকালে কাজে লাগবে।

তোদের বৈদ্যদেরও হেতেল হল খল, ওষুধ হল মুষ্টিযোগ, লাল চটি আর সাদা চটি।"

আর এক দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর দাদাঠাকুর গদাবাবুকে বললেন—'গদা, একটা লটারীর টিকিট কিনলে কেমন হয়? দু'জনে কিনবো, পুরস্কারের টাকাও দু'জনে সমান ভাগ করে নেবো।'

উত্তরে গম্ভীরকণ্ঠে গদাবাবু বললেন—'তুমি লটারীর টিকিট নিজে কেনো, আমার লটারীর টিকিট কেনা ছিল বলেই তো এই জবাকুসুমের সেন-পরিবারে জন্মেছি।'

দাদাঠাকুরের সংস্পর্শে গদাবাবুর জবাবও হোতো চোখা।

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় গদাবাবুর কলুটোলার বাড়ি দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছিল। অগ্নি সংযোগ করে ক্ষতিও করেছিল বাড়িটির, সেই সঙ্গে অনেক জিনিসপত্রও লুঠ হয়েছিল। গদাবাবু সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন, পরে কালীঘাটে নিজের একটি বাড়িতে চলে যান।

তখন দাদাঠাকুর জঙ্গিপুরে ছিলেন। সব খবর শুনে তিনি কষ্ট অনুভব করেছিলেন। অনেকবার অনেক চিঠিতে সে কথা দুঃখ করে জানিয়েছিলেন। পরে কলকাতায় এসে দাদাঠাকুর কালীঘাটের বাড়িতে গদাবাবুর সঙ্গে দেখা করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে দাদাঠাকুর বললেন—'গদা, তোর অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

গদাবাবু বললেন—'দাদা, কিছু জিনিসের জন্যে মন খারাপ হয় মাঝে মাঝে—যেমন, মায়ের বিয়ের খাট-পালং, বাবার বসবার চেয়ার-টেবিল, ইত্যাদি। তবে তোমারও দিন চলে যাচ্ছে—আমারও চলে যাবে। কিন্তু এটা জেনে রাখো আমার এখনও যা আছে তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

দাদাঠাকুর—'গদা, সবই মানুষের অভ্যাস, চলে যায় দিন সকলেরই। অনেকে বলে—'এটা আমার Habit, এ না হলে অসুবিধা হয়। Habit কি জিনিস? When you have it then it is your habit।'

একদিন বিকালে দাদাঠাকুর বৌবাজারের মোড়ে 'বিদূষক' ফিরি করছিলেন গান গেয়ে, হঠাৎ পুলিশ ভিড় দেখে এগিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ভিড় সরাতে লাগল। পুলিশের ধাক্কায় পথের উপর পড়ে গেলেন দাদাঠাকুর।

সেই সময়ে সেখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছিলেন গদাবাবু। সঙ্গে ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের কাকা বেচাবাবু। গদাবাবু গাড়ি থামিয়ে নেমে দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন—'দাদা, তোমার খুব লেগেছে?'

দাদাঠাকুর সহজ ভাবেই বললেন—'গদা, সামান্য একটা পুলিশের ধাক্কা সহ্য করতে না পারলে কি চলে! জীবনভোর ভগবানের কাছ থেকে অনেক ধাক্কা খাচ্ছি সেও তো সব সহ্য করতে হচ্ছে।'

গদাবাবু নিরুত্তর রইলেন।

দাদাঠাকুরের চেয়ে গদাবাবু অনেক কনিষ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু তিনি দাদাঠাকুরের অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কলকাতার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হয়ে ঐ দিনই সন্ধ্যায় নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে দাদাঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। দাদাঠাকুর কথায় কথায় দেশবন্ধুকে বললেন—'কলকাতায় এসে অনেক ভুল চোখে পড়ছে। আপনি এখন মেয়র হয়েছেন, ইচ্ছা করলে ভুলগুলো সংশোধন করে দিতে পারেন, May-or-May-not।'

উত্তরে দেশবন্ধু হেসে বললেন—'পণ্ডিত মশাই, আপনার যা

বক্তব্য 'বিদূষক' মারফত জানাবেন।—নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো সেই সকল ভুলচুক সংশোধন করতে।'

'বিদূষকে'র প্রত্যেকটি সংখ্যা পঞ্চাশখানি করে কিনতেন দেশবন্ধু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিতরণের জন্য। তিনি প্রায়ই দাদাঠাকুরকে বলতেন—' 'বিদূষকে'র মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব কিছু প্রচার করতে থাকুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে তার প্রতিকারের।'

সেই অনুরোধ অনুসারে রচিত হোলো 'কলকাতার ভুল' নামে বিখ্যাত গানটি। গানটি এখানে দেওয়া হলো :

॥ **কলকাতার ভুল** ॥

মরি হায়রে—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা,
(হেথায়) বুদ্ধিমানে করে চুরি, বোকারা পড়ে ধরা।
(মরি হায়রে···)
ভাবতাম কলুটোলায় কলু আছে—আছে তাদের ঘানি,
দেখি কলুর বলদ বস্তি সেথায় করে তেল আমদানী।
মুরগীহাটায় চুপ করে যাই কিনিতে রাম পাখী,
দেখি সারি সারি স্টেশনারী আসল জিনিস ফাঁকি।
চীনে বাজারেতে ভাবতাম চীনে থাকে খালি,
দেখি—ঘরে ঘরে দোকান করে যত সব বাঙালী।
লালবাজারে গিয়ে তবু ঘুচলো একটু ধাঁধা,
লালবাজার তো নাই—লোকের মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা।
লালদীঘিতে ভাবতাম দেখবো জলটি লাল টকটকে—
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠ'কে।
গোলদীঘিতে গিয়ে আমার লাগলো ভারী গোল—
চারকোণা দীঘিকে এরা সবাই বলে গোল!
পটলের ক্ষেত নাইকো তবু পটলডাঙা বলে,
(তবে) বিন্ পটলেই বছর বছর লোকে পটল তোলে।

শিয়ালদহের নামটা এরা দিলে কেবল ভুয়া,
(তবে) ট্রেনের গাড়ী শ্যালের মত করে হুয়া হুয়া।
লেবুতলায় গিয়ে দেখি লেবু নাহি মিলে।
বৌবাজারের নামটা বলো কেন শুধুই দিলে।
ধর্মতলায় ভাবতাম—বুঝি ধার্মিকেরাই থাকে—
(দেখি) চাঁদনীতে একটাকার জিনিস তিনটাকা দাম হাঁকে।
থিয়েটার রোডেতে দেখি থিয়েটার তো নাই,
ছিলেন থিয়েটারের বড় জিনিস দিলীপকুমার রায়।
চোরবাগানে ভাবতাম চোরে করবে সর্বনাশ,
গিয়ে দেখি আছে সেথায়—সাধু বাবুর বাস।
চাষা ধোপা পাড়ায় দেখি বামুন কায়েত থাকে,
কোন হতচ্ছাড়া ধোপাপাড়া নাম দিয়েছে তাকে।
একটা সাঁকো নাইকো তবু জোড়া সাঁকো নাম—
দিনে রেতে সমান রবির উদয় দেখিলাম।
ভাবতাম সাত রাজার ধন মানিক বুঝি মানিকতলায় থাকে,
খানিক পেলে খুঁজে ট্যাঁকে গুঁজে পালাতাম এই ফাঁকে।
হাতীও নাই বাগানও নাই হাতীবাগান বলে—
বাদুড়বাগানেতে দেখি বাদুড় নাহি ঝোলে।
উল্টোডিঙ্গি দেখতে গিয়ে বাড়ালাম জঞ্জাল,
দেখি—সোজা ডিঙ্গি ভর্তি আছে উল্টো ডিঙ্গির খাল।
কাঁকুড় খাবো বলে একদিন কাঁকুড়গাছি গেলাম,
কাঁকুড় কোথায়! যোগোদ্যানে ঠাকুর দেখে এলাম।
বিয়ে করলেই স্বামী হয় সে আগে জানতাম আমি,
হেথায় মাথা নেড়া গেরুয়াপরা বিয়ে না করা স্বামী।
রাজ্যহীন মহারাজ এঁরা—কিবা রাজ পোশাকের শোভা!
মহারাজ ম'লে মহারাণী হবেন না বিধবা।
বাগবাজারে ভাবতাম বুঝি বাঘে খাবে ধরে,

সেথায় দেখি মদনমোহন গোকুল মিত্রের ঘরে।
এমনি ভুলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি রগড়ে,
দেখি ইসলাম ভায়াও বাঁধলো বাসা বরাহ নগরে।
ভুলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাত ধরল গিঁটে।
কত গোঁসাই ঠাকুর ঠুকছে সেলাম মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে।
ভাবতাম রাধা বাজার আছে বুঝি শ্যাম বাজারের বাঁয়ে।
দেখি শ্যাম গিয়েছেন বহুৎ দূরে রাধার মানের দায়ে।
এমনি ভুলের মধ্যে বেকুব হ'য়ে বেড়াই মাঠে মাঠে—
কবে নিমগাছটা দেখতে যাব নিমতলার ঐ ঘাটে
শুয়ে দড়ির খাটে—
তবেই আমার দুঃখ কাটে

'কলকাতার ভুল' নামক এই গানটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য —একদিন দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'পণ্ডিতমশাই, আমার ভাই রবির সঙ্গে আপনার কখনো দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'কি করে হবে মা। তিনি (রবির উদয়) যখন আসেন, আমি (শরৎচন্দ্র) তখন চলে যাই। আবার আমি যখন আসি তিনি তখন থাকেন না।'

দাদাঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ না হওয়ার এই কারণটিও স্বর্ণকুমারী দেবী উপভোগ করে বললেন—'আপনার সঙ্গে আলাপ হলে রবি খুব খুশী হোতো।'

দাদাঠাকুরের কাছেই শুনেছি স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সরলা দেবী দাদাঠাকুরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দাদাঠাকুরের জঙ্গিপুরের বসতবাড়ি সরলা দেবীই মধ্যস্থ হয়ে তাঁর বান্ধবী পাকুড়ের রাণীর কাছ থেকে কিনে দেন। সে কথা আগেই জানিয়েছি।

'কলকাতার ভুল' রচনাটি রসরাজ অমৃতলাল বসুকেও আনন্দ দিয়েছিল। গানটি প্রকাশিত হবার পর দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলে অমৃতলালবাবু কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন—'ব্যাটা, কোন জঙ্গল থেকে এসে আমার কলকাতার ভুল ধরেছিস!—এর জবাব আমি দেবো তোকে।' কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি, তার আগেই অমৃতলাল অমৃতলোকে প্রস্থান করেন। তাই দাদাঠাকুর নিজেই রসরাজের সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন—'কলকাতার খেদ' লিখে। 'আত্মঘাতী দেবশর্মা' ছদ্মনামে জবাবটি লিখেছিলেন তিনি। অনেকের মতে 'কলকাতার ভুল'এর চেয়েও 'কলকাতার খেদ' বেশি আকর্ষণীয় হয়েছিল। সেই 'কলকাতার খেদ'টি উদ্ধৃত করা হোলো পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য।

॥ কলকাতার খেদ ॥

মনের দুখে কলকাতা কেঁদে বলে, ভাই!
আমার মধ্যে ভুল পেলে, ভুল আর কি কোথাও নাই?
কলকাতার ভুল লিখলেন যিনি, আমি বলি তাঁকে,
রাগ করো না দাদাঠাকুর—পার্সনাল অ্যাটাকে।
আকাশেতে শরৎচন্দ্র দেখেছি তো সবে—
মলিন বেশে খালি পায়ে নেমে এল কবে?
বিদ্যা জাহির করলে বড় কলকাতার ভুল ধরে,
পণ্ডিত হয়েছিলে তুমি কোন্ টোলেতে পড়ে?
লোকের মুখে শুনি তোমার জঙ্গিপুরে বাড়ি,
তোমার মত সেথায় বুঝি সবাই মিলিটারী?
বৌবাজারে বৌ না পেয়ে হতাশ হলেন যিনি—
দিনাজপুরের পত্নী তলায় পেলেন কি গৃহিণী?
ব্রাহ্মণীরে একটি কথা জিজ্ঞাসিও প্রভু,
'নাথনগরে' খুঁজতে তোমায় গেছিলেন কি কভু?

বাপকে দেখতে 'জনকপুরে' যাও কি তাড়াতাড়ি,
'দাদুপুরে' আছে বুঝি পিতামহের বাড়ি ?
'কাঁদি'তে কি যাও হে প্রভু চোখে কান্না পেলে ?
'নন্দনপুরে'তে বুঝি থাকে তোমার ছেলে ?
চাল ফুরোলে 'দানাপুরে' যোগাড় করো দানা,
'খানা জংশনে'তে এসে পাকাও বুঝি খানা ?
ডাল ফুরোলে ডোমজুড়েতে কিনে নিয়ে ঝুড়ি,
'বুট' পরে আর 'মটর' চ'ড়ে চলো কি 'মুসুরী' ?
তেল কেনো 'তেলেনী পাড়া'য় 'নুন নগরে' নুন ?
'বারুইপুরে' পান কেনো আর 'চুনারেতে', চুন ?
'গাইবাঁধা'তে গাই বাঁধো, আর 'এঁড়েদহে' এঁড়ে,
'খড়দহ'তে খড় খাওয়াতে আনো বুঝি তেড়ে ?
'গোবরডাঙায়' ফেলতে গোবর এস বারে বারে,
ঘুঁটে করে বেচো হুগলির 'ঘুঁটিয়া বাজারে' ?
দুধ কিনিতে 'গোয়ালপাড়া' আসাম ছোটো বুঝি ?
'দৌলতপুর', না 'সম্বলপুরে' রাখলে তোমার পুঁজি ?
'শান্তিপুরে' যাও কি তুমি অশান্তি দমনে,
কিম্বা ছোট বোলপুরেতে 'শান্তিনিকেতনে' ?
মুশকিলে পড়িলে কি সব 'আসানসোলে' যাও ?
'মছলিপট্টম' হতে কি গো মছলি এনে খাও ?
'শিবপুরে'তে গেলেই কি হয় যাওয়া কৈলাস-কাশী ?
তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখ 'দেবগ্রামে' আসি ?
পুষ্প চয়ন করতে কি গো 'ফুলতলা'তে যাও ?
শিব পূজার বেলপাতা 'বেলডাঙা'তে পাও ?
চন্দন ঘষিয়া নে যাও 'চন্দননগর' আসি,—
বামুন বলে বোধ হয় কিছু বলে না ফরাসী ?
রাগ হলে কি 'মাথাভাঙা'য় মরো মাথা খুঁড়ি ?

জলপাই-এর সন্ধানে বুঝি ছোটো 'জলপাইগুড়ি' ?
'রাধানগর' 'কৃষ্ণনগর' বুঝি পাশাপাশি ?
যুগলমিলন হয় কি তাঁদের 'কদমতলা'য় আসি ?
'মানিকতলায়' মানিক খুঁজে কষ্ট পেলেন বাছা—
'মানিকগঞ্জ', 'মণিপুর' দেখে যেয়ো 'মুক্তাগাছা'।
নবাব সাহেব 'নবাবগঞ্জে' বেঁধেছেন কি বাসা ?
মিলন-আশে রোজই কি হয় 'বেগমপুরে' আসা ?
'বনগাঁ' হতে 'বাগের হাটে' মিলিয়ে বাগেরা,—
'ঘোড়ামারা'য় ঘোড়া মারে, 'ভেড়ামারা'য় ভেড়া ?
'রাজপুতনা'য় রাজপুত নাই এই কি সবে ভাবে ?
'দ্বারভাঙ্গা'র ভাঙা দ্বার কি ভাঙাই থেকে যাবে ?
'কানপুরে'তে কান রেখে কি 'শোনপুরে'তে শোনো !
'ভাগ্যকুল' আর 'নসিবপুরে' নিজের কোষ্ঠী গোনো ?
শুধু শুধুই ভুল ধরতে লাগলে আমার পিছু,
কম্বলের লোম বাছতে গেলে রয় না বাকি কিছু।

রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন দাদাঠাকুর। অনেকেই দাদাঠাকুরকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করায় ভারাক্রান্ত মনে দাদাঠাকুর জীবনটা কিভাবে শন্-শন্ করে চলে যাচ্ছে সেইটেই শোনালেন।

॥ জীবনটা চলে যাচ্ছে শন্ শন্ ক'রে ॥

শন্ শন্ কোরে জীবন চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ কান পেতে ভাল কোরে শুনলে শন্ শন্ শব্দও শোনা যায়। সন ১৩২৭, সন ১৩২৮—এরকম করে সন সন করে জীবন যাচ্ছেই। আবার শন্ শন্ শব্দ করেও জীবন চলে যাচ্ছে।

ছেলে জন্মাতেই দরকার হয় birth registration তারপর vaccination, একটু বড় হতেই তখন education দিতে হয়, education দিতে হলেই একটা institution-এ admission নিয়ে daily lesson, preparation করে inspection, examination-এর ঝামেলা সামলে, ইংরেজী পড়তে হলেই pronounciation, punctuation, direction, dictation, translation, pre-position, conjunction, interjection, narration—এসব সামলাতে হয়। mathematics পড়তে গিয়ে addition, subtraction, multiplication, division, ratio-proportion, equation, permutation, combination—এ সবের অত্যাচারও আবার সামলাতে হয়। geometry পড়তে গিয়ে definition, proposition, construction, solution! final examination ছিল entrance। সন্ সন্ করে যায় না—মধ্যে ফাঁক পড়ে যায় দেখে সরকার বাহাদুর যাতে ফাঁক না পড়ে তার জন্যে নাম দিলেন matriculation। matriculation examination দিয়ে result publication-এর জন্যে wait করছে —যেই ভাল informationটি পেয়েছে তখন কবে session begin হবে, কোন্ কলেজে admission নেবে, কোথায় selection বই পাবে, Wordsworth, Tennyson খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন সময় শুনলো চারিদিক থেকে marriage negotiation!······ছেলেকে তুলে দিচ্ছে auction-এ। যে highest bidder তার সঙ্গে close relation। তারপরই celebration। তারপর বাড়িতে বছর বছর God's creation, বছর বছর অন্নপ্রাশন। তখন অসন বসন ভূষণ যোগাড় করতে ব্যাপার লোমহর্ষণ। কোনদিন অনশন, কোনদিন অর্ধাশন। তখন অভাবে পড়ে wife-এর সঙ্গে friction, তখন চাক্রীর জন্য obligation-এ পড়তে হয়। তখন এখানে ওখানে application করার দরকার। যে competition-এর বাজার,

nomination-এ নামটা যায় কি-না যায় বোলে তার সঙ্গে ছখানা একখানা recommendation দিতে হয়, যদি একটা চাক্‌রী মিললো তাও on probation, যেই confirmation হয়েছে তখন aspiration, ambition বেড়ে যায়। তখন temptation-এ পড়ে extra collection করতে hesitation করে না। যেই উপরওয়ালা information পেয়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই explanation call। explanation-এ satisfaction না হলে suspension—না হয় prosecution। হাতে পায়ে পড়ে—একে ওকে তাকে তদ্‌বির কোরে যদি convictionটা বেঁচে যায় তখন এই constitutionটা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তখন উপরওয়ালা বললে—invalid pension নাও—representation করা হোলো for extension, sanction হোলো না—regulation-এ তা নেই বলে। কাজেই একজন physician ডেকে examination কোরে description শুনে prescription হোলো। বললেন—তোমার consumption হয়েছে। একটা solution না হয়, emulsion ব্যবহার করতে হবে।—এতে যদি না সারে injection করবো—। একদিন হঠাৎ perspiration and suffocation। Physican এসে বললেন—Fomentation করো। তখন soulটা body-র সঙ্গে non co-operation করে আর কি! fomentation-এ আর কিছুই হোলো না—তখন wife, children-এর lamentation। তারপরই funeral procession for cremation। তারপরই শ্মশানে চিতাসন। চিতাসনের উপর হুতাশন। bodyর তো এইখানেই অবসান—থাকে বাকি soul, তার eternal damnation or salvation।

সে তো চলেই গেল—কিন্তু ঝড় বাতাস থামলেও দূরে যেমন তার শন্ শন্ শব্দ শোনা যায়—তেমনি এর শন্ শন্ থামে না। এত দিনে যা collection করে গেল তা নিয়েই তখন litigation আরম্ভ হয়ে গেল। তখন succession certificate নিয়ে arbitration

করে daughter and son-এর মধ্যে partition করে হয় অবসান।

একসময় আর্ট থিয়েটারে প্রতি অভিনয় সন্ধ্যায় ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে বেশ একটা জমাট আড্ডা বসতো। রঙ্গালয়ের ডাইরেক্টররা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই সে বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। কর্ণার্জুন নাটকের শততম অভিনয় রজনী উদ্‌যাপনের সন্ধ্যায় ঐ রকম আড্ডা বসেছে। জমজমাট আড্ডা। হঠাৎ খবর এলো হাতীবাগানের মোড়ে দাদাঠাকুর কাগজ বিক্রি করছেন। বৈঠকে উপস্থিত সকলেই এবং বিশেষ কোরে দাদাঠাকুরের অপরিসীম গুণগ্রাহী ও তাঁর স্নেহভাজন সত্যব্রত সেন (গদাবাবু) দাদাঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ মশাই দাদাঠাকুরকে আনতে গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে জানালেন যে, পণ্ডিতমশাই তাঁর নিজের অভিনয় অর্থাৎ কাগজ বিক্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসতে রাজী নন। স্বর্গত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (লেখকের পিতৃদেব) সেদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রবোধচন্দ্রের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে দাদাঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং যে ক'খানি কাগজ তখনও অবিক্রিত ছিল সেগুলি কিনে নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে বললেন—'এবার ওঁকে নিয়ে চলুন।'

পরবর্তী কালে দাদাঠাকুর বলেছিলেন—'ভাই, থিয়েটারে যাবার সেদিন ইচ্ছে ছিল না। তাই মাথা খাটিয়ে ওজরও একটা বের করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে যেতেই হোলো।'

বলা বাহুল্য, দাদাঠাকুরের আগমনে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই অপরিসীম খুশী হয়েছিলেন। স্বয়ং অপরেশচন্দ্র তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রতিভাধর নট দানিবাবু সেখানেই ছিলেন। হাত তুলে

নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, আজকাল চোখে ভাল দেখতে পাই না, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।'

দাদাঠাকুর গিয়ে পাশে বসে যখন কুশল জিগ্যেস করে তাঁর সঙ্গে আলাপরত, তখন অদূরে উপবিষ্ট প্রথিতযশা অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী কৃত্রিম ক্ষোভের সুরে দাদাঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললেন—'পণ্ডিতমশাই, আমাদের দিকেও একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন।'

দাদাঠাকুরের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—গরীব ব্রাহ্মণ, দানী দেখলেই তাঁর কাছে যাই। আপনার ও তিনটে কড়ি একমাত্র বামুনের হুঁকোয় লাগানো ছাড়া আর কোন কাজে তো লাগে না। তাই ওদিকে আর ঘেঁষিনি।'

হাসির রোল পড়ে গেছল সারা ঘরে, এবং বলাবাহুল্য তাতে তিনকড়িবাবুও যোগ দিয়েছিলেন।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়িতে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতি বছর দুর্গাপূজো হতো। সেই পূজোয় তাঁর বাড়িতে গণ্যমান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন ঘটতো। একবার পূজোর মাত্র ক'দিন আগে পূজোর ক'টি দিন নির্মলবাবুর বাড়িতে কাটিয়ে যাবার জন্য অনেকেই অনুরোধ জানালেন দাদাঠাকুরকে। কিন্তু দাদাঠাকুর দেশে (দাদাঠাকুরের ভাষায় তাঁর রাজধানী) চলে গেলেন। পরে সপ্তমীর দিন ফিরে এসে নির্মলবাবুর বাড়িতে হাজির হতেই সকলে অবাক হয়ে হাসলেন, খুশিও হয়েছিলেন। নির্মলবাবুর মাতাঠাকুরাণী দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন—'বাবা, বছরকার দিনে বাড়ি থেকে তুমি চলে এলে ?'

নির্মলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিভিলিয়ান কমলচন্দ্র পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। নির্মলবাবু ভাইকে বললেন—'জানো কমল, পণ্ডিতমশাই এক্সটেম্পোর গান রচনা করতে পারেন।'

কমলবাবু এবং আরও অনেকে শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করায় নির্মলবাবু দাদাঠাকুরকে অনুরোধ করলেন একটি এক্সটেম্পোর গান শোনাবার জন্য।

দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—যদি পুরোনো কোন গান তিনি নতুন বলে চালিয়ে দেন, নির্মলচন্দ্র ধরবেন কি করে ?

আইনবিদ নির্মলচন্দ্রকে ঠকানো অত সহজ ছিল না। তিনি জানালেন—গানের বিষয়বস্তু তিনি বলে দেবেন। যেমন, সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও কেন তিনি হঠাৎ পুজোর মাত্র ক'দিন আগে বাড়ি চলে গেলেন এবং ফিরেই বা এলেন কেন এত শীঘ্র তা গানে জানাতে হবে। —আর অঞ্জলি দিতেই বা তিনি নারাজ কেন ?—আর একটি বিষয়ও গানে উল্লেখ থাকা চাই।—সেটি হলো, গান্ধীজী সকলকে খদ্দর ব্যবহার করতে বলেছেন। তিনি (নির্মলচন্দ্র) গান্ধীজীর নির্দেশ মেনে খদ্দর পরেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা খদ্দর পরতে চায় না।

দাদাঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। সকলের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

শুরু হলো গান :

'দুটো মনের কথা বলি তোরে ওমা জগদম্বে' গানের এই প্রথম লাইনটি গাইতেই অমৃতলাল বসু তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িকে বলেছিলেন—'শিশির, ব্যাটা বামুন মোলো। "ম্বে" দিয়ে লাইন শেষ করেছে। মেলাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

দাদাঠাকুর গেয়ে চললেন :

দুটো মনের কথা বলি তোরে ওমা জগদম্বে !
বল্ দেখি এই দীনের দুঃখ কোন্ কালে মা কম্‌বে ?
যত পাওনাদারে লাগায় ল্যাঠা,
(তাই) পালিয়ে এসেছি ক্যাল্‌কাটা,
হেথায় যদি ধরে ব্যাটা,

পালাবো মা বম্বে।
শোনো মাগো দশভুজা,
সেদিন করবো তোমায় পূজা,
(যেদিন) নামবে মা অভাবের বোঝা—
লক্ষ টাকা জমবে।
দেশের দুঃখ দেখে গাঁধী,
পবতে বলে গেছেন খাদি,
যত হারামজাদা হারামজাদী
(তা) ঠেকায় না নিতম্বে।

গান শেষ হলে চারিধারে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দাদাঠাকুর বসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় অমৃতলাল তাঁকে বললেন—'বাবা, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, জানি। তবু আমার একটা অনুরোধ রাখ। আর একটা কলি যোগ কর্ তোর যা ইচ্ছে তাই দিয়ে।'

অমৃতলালের ইচ্ছে অনুযায়ী আর একটি কলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে রচনা করলেন :

'যদি কষ্ট দেওয়াই মনে থাকে,
আর কেন রাখিস আমাকে,
ডেকে নে মা শেষের ডাকে,
কাজ কি মা বিলম্বে ?'

আনন্দে উচ্ছল হয়ে অমৃতলাল দাদাঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রসঙ্গত দাদাঠাকুর রচিত দু'টি কবিতার অংশবিশেষ ও দুটি মাত্র কবিতা সম্পূর্ণ দেওয়া হলো।



[বোতল-এর ছবিযুক্ত মলাট লাগিয়ে কতকগুলি স্বরচিত কবিতা একত্রে প্রকাশ করেছিলেন। দাদাঠাকুর প্রচ্ছদের ছবিটি এখানে দিলাম]

॥ মদিরা মাহাত্ম্য ॥

পজ্‌ঝটিকা [অংশ বিশেষ]

দেবি ! সুরেশ্বরি ! বোতল বাসে ভূতলশায়ী কর নিজদাসে,
নর্দম-কর্দম-লিপ্ত শরীরে, কাপুরুষাধম কর কত ধারে।
কণ্ঠে পরিহিত যজ্ঞীয় সূত্র, শৌণ্ডিক-গৃহ-গত-ব্রাহ্মণ পুত্র
গমনে নানা মতলব গুপ্ত, নির্গম সময়ে গুজন বিলুপ্ত।
কভু গত ডানে, কভু গত বামে, নর্তন কুন্দন বঙ্কিম ঠামে ;
পতনোত্থানে কত শত রঙ্গে, রক্তারক্তি যে বিক্ষত অঙ্গে।
ক্রমশঃ বর্ধিত পানাসক্তি, পানে পুঞ্জিত বক্তার শক্তি,
অর্থ-বিবর্জিত প্রলাপ-বাক্য রক্তিম রাগে কুটিল কটাক্ষ।
অপ্রিয় গন্ধে অপ্রিয় বদনে, গমনে শঙ্কা-গুরুজন সদনে,
অবিরল রহিবে পিছনে হটিয়া, সুমধুর বাক্যে উঠিবে চটিয়া।
তরু-তল-গত কর কতই গৃহস্থে, লাঞ্ছিত পুলিস-কুলীশ-হস্তে.
পঞ্চ আইনে প্রাপ্ত শাস্তি,— স্পর্ধা 'হম্‌সে দীগর নাস্তি।'
ইয়ার বান্ধব জুটিয়া পুটিয়া, সঞ্চিত বঞ্চিত করয়ে লুটিয়া।
লণ্ড ভণ্ড সব শিক্ষা-দীক্ষা, শেষে ভাগ্যে চাউল ভিক্ষা।
মায়া বিরহিত দারা পুত্রে, শায়িত সদাই পুরীষ মূত্রে।
বর্ণিল তব গুণ ত্রাসে ত্রাসে, ও রস-কিঞ্চিৎ-বঞ্চিত দাসে।

॥ টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম ॥

[অংশ বিশেষ]

জয় ধন জয় অর্থ রাজমূর্তিধর ।
রৌপ্য খণ্ড কর কৃপা সুখের সাগর ॥
জয় মুদ্রা জয় টাকা জয় জয় আধুলি !
কৃপণের প্রাণধন দাতার কাছে ধূলি ॥
টাকা কড়ি বিনেরে প্রচুর অর্থ বিনে ।
দুঃখে দরিদ্রের জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল খেটে খেটে রাত্রি গেল শু'তে ।
না পাইনু দুই বেলা পেট ভ'রে খেতে ॥
টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু ।
অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাব্যাচ্যাকা হৈনু ॥
বন্যার মতন পুত্র কন্যা এলো ঘরে ।
কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে ॥
যখন টাকা জন্ম নিল টাকশাল ভিতরে ।
মর্ত্যলোকে নরগণ লোভ বৃষ্টি করে ॥
মহাজন রেখে এলো খাতকের ঘরে ।
সুদরূপে তথা প্রভু দিনে দিনে বাড়ে ॥
দেনাদার রাখিল নাম কর্জ আর দেনা ।
মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা ॥
ডিক্রীদার নাম রাখে মায় খরচা দাবি ।
দেনমোহর নাম রাখে মুসলমানের বিবি ॥
পশ্চিমবঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে ।
পূর্ববঙ্গবাসী সব টাহা বলে ডাকে ॥

সাহেব রাখিল নাম 'রুপি' আর 'মানি'।
বিলাতে হইল নাম পাউণ্ড শিলিং গিনি ॥
'ডলার' রাখিল নাম আমেরিকাবাসী।
'ফ্র্যাঙ্ক' নাম ফ্রান্স দেশে রাখিল ফরাসী ॥
'মার্ক' নাম রাখিল জার্মান এম্পায়ার।
রুশিয়ায় 'রুবল্' আর সুইডেনে 'ক্রোনার' ॥
রূপেয়া রাখিল নাম দেশোয়ালী ভাই।
টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই ॥
তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী
'ফেয়ার' রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানি ॥

॥ বীণাপাণির নিকট দানাপানির আব্দার ॥

এলেন মাতা বীণাপাণি
ভক্ত কয় যুগ্মপাণি—
দানাপানি জোটে না মা পেটে।
ক'রে তোর আরাধন
হলেম মাগো হারাধন,
সারাক্ষণ মরি খেটে খেটে।

বাবা দিলেন হাতে খড়ি,
যা ছিল তাঁর হাতে কড়ি,
যাতে করি দিন চলিত খাসা।
খরচ ক'রে হলেম এম-এ,
উঠবো কি মা গেলেম নেমে,
গেল থেমে প্রাণের উচ্চ আশা।
ভাবতাম মোরা বড়লোক,
বাবার হলো পরলোক,
মরলোক ছেড়ে গেলেন তিনি।
সেদিন আমার ঘুচলো ধাঁধা,
সবই আছে দেনায় বাঁধা,
দেখলাম আমি বহু টাকায় ঋণী!
লেখাপড়ার অহঙ্কারে—

গ্রাহ্য করি নাই যারে,
ঘৃণায় বলেছি সুদখোর;

বুঝিলাম এতদিনে
তাহারি নিকটে ঋণে
গলা শুদ্ধ ডুবে আছে মোর !
রোজই সে করে তাগাদা,
(এখন) সেই পণ্ডিত আমি গাধা
কাঁদাকাটি করি কত মত।
এখন দেখা পেলে তাঁর,
আগেই করি নমস্কার,
কথা বলতে করি ইতস্ততঃ
(ভাবি) এতে তুষ্ট থাকে যদি,
করি তার খোসামোদী
তাহাতেও পাইনাকো পার—
তাগাদা করিতে আসে,
তুষ্ট হয় কি মিষ্ট ভাষে ?
বলে—জুয়াচোর বাটপাড়।
সুদ ও আসল ধ'রে,
দেখিল হিসাব ক'রে,
সম্পত্তি যা রয়েছে রেহানী
এখন হ'লে নীলাম,
হতে পারে ততো দাম,
মোকদ্দমা করিল দেয়ানী।
হাকিম দিলেন ডিক্রী
নীলামে হইল বিক্রি
নিজে ডেকে নিল সে সকল।
তারপর মহাজন
ক'রে মহা আয়োজন,
ভিটে মাটি লইল দখল।

পাশ করি যবে বি-এ
বাবা দিয়ে দেন বিয়ে,
নিয়ে থোক ছ'হাজার টাকা :
পরীর মতন বধূ
তাও আবার নয় শুধু
স্বর্ণ দিয়ে সর্ব অঙ্গ ঢাকা।
বেচারী বৌ-এর বাপ
ক'রেছিল মহাপাপ,
আমারে সুপাত্র ভাবি তাই ;
মুক্ত হলো কন্যাদায়,
পেয়ে দয়ালু বেয়াই—
তাঁরও আজ ভিটেখানি নাই।
আমার শ্যালকগুলি
কেউ কেরাণী মুটে কুলি,
সূচ্যাগ্র মৃত্তিকা নাই দেশে।
কি করে পেটের দায়
রয়েছে কলিকাতায়
রাত্রি কাটে হোটেলে বা মেসে।
বৌটিরে বা পাঠাই কোথা
কারে বলি দুখের কথা,—
ব্যথা পেয়ে নিজে হ'তে বলে—
কোলকাতাতে চাকরী খোঁজো
ভাড়ার ঘরে মাথা গোঁজো।
গয়না ক'খান বেচে য'দিন চলে।
অগত্যা করিলাম তাই,
এসে সেই কোলকাতায়,

নাম লেখালাম কেরাণীর দলে—
সারাদিন কলম পিষে
মজুরী যা পাই আপিসে
কোন ক্রমে পেটটা যাচ্ছে চলে।

তারপর পুত্র কন্যা,
আসিল প্রবল বন্যা
ফ'লে গেল ডি. এল. রায়ের গান।
যার ঘরে অন্ন নাই,
তার ঘরে খাঁই খাঁই,
কেন যে জোটান ভগবান!
ভাবিলাম দুনিয়ায়
বোধহয় আর নাই,
হতভাগা এ অভাগা সম।

ক'বছর হলো পার
গৃহিণীর অলঙ্কার
সব হলো উদরায় নমঃ।
যা' করি মা রোজগার
অন্ন তাতে রোজকার
চলে কিন্তু ব্যারাম পীড়ায়
ওষুধ আর ডাক্তারে
মাসে মাসে দফা সারে,
বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে যায়।
মেয়েটিও বড়ো হলো
বয়স বছর ষোল,
যে দেখে সে দেয় টিটকারী।

কি করি কোথায় যায়
দায়ের উপর দায়,
বাড়ীওলা বলে ছাড়ো বাড়ী।
দাঁড়াতে বসেছি পথে,
এইবার কোন মতে—
কষ্টে করি তোর আবাহন।
দায়সারা মত পূজা,
করিলাম শ্বেতভূজা,
দীন দুঃখী আমি অভাজন।
তোমার সার্টিফিকেটে
সাধ মোর গেছে মিটে,
সব তোরে সমর্পণ করি।
স্থির করেছি দয়াময়ী,
হইব দারিদ্র্য-জয়ী
বিষ খেয়ে কিংবা ডুবে মরি।
আমার স্নেহের বাছা
এতগুলি কচি কাঁচা
ইহাদের কেহ নাই আর।
এদের করিতে স্নেহ,
রহিবে না আর কেহ,
লও মাগো ইহাদের ভার।

মাতা কন—শুনো বাপ,
কেন এত অনুতাপ,
মহাপাপ আত্মহত্যা করা।
আমার সন্তান যত
সবাই তোমার মত

দরিদ্র নব্বই শতকরা।
আজি তো সময় নাই
সান্ত্বনা করি তোমায়,
শান্ত তুমি হবে বাপ যাহে
লজ্জা দিও না রে মাকে,
লিখে যুক্তি দেব ডাকে,
পাবে তুমি আগামী সপ্তাহে।

॥ ভক্তের দানাপানি ব্যাপারে বীণাপাণির সু যুক্তি ॥

নানাস্থানে খেয়ে পূজা
বীণাপাণি শ্বেতভূজা
ফিরিলেন আপন মন্দিরে।
ভক্তেরে উত্তর দিতে
নিরিবিলে এক চিতে
পত্র লিখিলেন ধীরে ধীরে :
পরম কল্যাণবর,
অস্থির হইয়া বড়
সেদিন দিয়েছো লজ্জা মোরে ;
দারিদ্র্য করিতে অন্ত
করতে চাও জীবনান্ত
কেন ভ্রান্ত যাবি শুধু ম'রে ;
মনে করিও না দুঃখ
সত্য কথা হবে রুক্ষ
সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখ মনে—
আমি বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী,
নহি কিন্তু বিত্ত-দাত্রী,
মাতৃ নিন্দা কর কি কারণে ?

দেব দেবী আছে যত,
ভিন্ন ভিন্ন কার্যে রত,
ডিপার্টমেন্ট ভাগ করা আছে-

লেখাপড়া গীত বাদ্য
শেখানো আমার সাধ্য
আর কিছু নাই মোর কাছে
ধন ধান্য চাহে যেবা,
লক্ষ্মীর করুক সেবা
ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট তাঁর,
সে যদি আদেশ করে
পৌঁছাইয়া দিবে ঘরে
যক্ষরাজ-কুবের পোদ্দার।

আমার ডিপ্লোমা বলে
কোনরূপে দিন চলে,
শাক অন্ন হয় কায় ক্লেশে ;
যদি বাড়ে পরিবার
খাইবার পরিবার
অবশ্য হইবে কষ্ট শেষে।
আফসোসে কিবা হবে ?
বৌ-মারে আনো যবে
প্রজাপতি দেব করুণায়
ডিপ্লোমার জোরে মোর,
কত টাকা বাবা তোর
নিয়েছিল বধিয়া বেয়াই ?
সে টাকার সুদ ধর,
বেতনটি যোগ্ করো
কম টাকা হবে না তাহাতে-
তা না ক'রে টাকাগুলি
উড়াইলে যেন ধূলি,

প্রোসেসনে আর বৌ-ভাতে !
পরের চোখের জল,
ফেলার ফলিল ফল,
থাকিল না ব্যাটা বেচা টাকা।
অন্য লোকে দুঃখ দিয়ে,
ফাটাইয়া তার হিয়ে
দেখেছো কি কারো সুখে থাকা ?
জোটায়ে আমি তোমায়
দিই নাই বৌ-মায়
ঘটন ঘটালে প্রজাপতি।
কাচ্চা বাচ্চা এক পাল
জুটাইয়া যে জঞ্জাল,
ষষ্ঠী দেবী দিল এ দুর্গতি।

ভোগ ও বিলাস আদি,
সে সব তো কৃত ব্যাধি
গতানুগতিক হ'য়ে নিলে।
চা, চুরুট আদি যত
ফ্যাসান শিখিয়া কত,
ডুবে মরো স্বখাত সলিলে।
আর দেখ চারি যুগে,
মোর ভক্তগণ ভুগে,
দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু তার।
বেদব্যাস, কালিদাস
কাশীরাম, কৃত্তিবাস,
সুখে দিন চলেছে কাহার ?

দরিদ্র মাইকেল মধু
কষ্টে দিন কাটিয়ে শুধু
তনু ত্যাগ করে হাসপাতালে।
পুত্র মোর হেমচন্দ্র—
সেও হয়েছিল অন্ধ,
সুখ পেয়েছিল কোন্ কালে ?
সুকবি রজনীকান্ত
তাহারও হলো দেহান্ত
মেডিক্যাল কলেজে কটেজে।

আমার সেবক যারা,
অভাবে ভুগিছে তারা,
আমারই অদৃষ্ট বাপ্ সে যে।
যদি বলি বিশ্বকবি—
ধনী সে কবীন্দ্র রবি,
জন্মেছে সে ধনীর প্রাসাদে।
যদি বলো এই ছেলে
নোবেল প্রাইজ পেলে
জানো বাপ্ জলে জল বাঁধে
আর দেখাইবে যাহা
এন্ চন্দ্র, এন্ লাহা,
মোর কিছু নাই তাতে হাত।
তাদের ভাগ্যের গুণ—
লইয়া সিলভার স্পুন্
জন্মিয়া পেয়েছে দুধ-ভাত।

বড় চাকরী করে যারা
যদি বলো সুখী তারা
মিছে কথা, এটা তোর ভুল।
পরের গোলামী করা—
সব তারা জ্যান্তে মরা,
সকলেই তোর সমতুল।
পরের পয়জার নিয়ে
স্বাধীনতা বিকাইয়ে
সুখে কভু থাকা কিরে যায়?
আজ গেল রংপুরে
কাল এলো ঢাকা ঘুরে
পরশু পাঠালো খুলনায়।

কাহারে সুখী বলিস্?
কেউ উনিশ, কেউ বিশ,
এক ক্ষুরে মাথা সব মোড়া।
কৈফিয়ত আছে যার
কোন্‌খানে সুখ তার
কেহ গাধা, কেউ ছ্যাকড়া ঘোড়া।

টাকায় হইলে সুখ
অনেকের যেতো দুখ,
সুখ কিরে বাজারে বিকায়?
সন্তোষ থাকিলে মনে,
সুখী হয় দীন জনে,
রাজার প্রাসাদে যাহা নাই।

দেখরে উদাহরণ
শিবের ক্ষুধা-হরণ,
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয়ে যায়।
অন্নপূর্ণা তাঁর ঘরে
অন্ন দেন ক্ষুধাতুরে
ইন্দ্রালয়ে অন্নদান নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজ জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে কয়েকদিনের জন্য এসেছিলেন। সেই সময় অমল মিত্র কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাদাঠাকুরের পরিচয় করিয়ে দেন। এতে কেদারবাবু যে কত খুশী হয়েছিলেন তা পূর্ণিয়া থেকে অমল মিত্রকে লেখা এক পত্রে জানিয়েছিলেন। ১১।৪।৪৬ তারিখে সেই পত্রে কেদারবাবু লেখেন :

'কল্যাণীয়েষু,

প্রিয় অমল,

তোমার ভায়ের (নির্মলের) কল্যাণে আমি পরম লাভ করে এসেছি। অসময়ে বা অবেলায় দেখা হলেও, আমি ধন্য হয়েছি। তোমরা বুঝতে পারবে না—আমার দীর্ঘ জীবনে এ আনন্দ আমি পাইনি। সত্যিকার ব্রাহ্মণও ভাগ্যে জোটেনি। ব্রাহ্মণ চিরদিনই গরীব। সেই গরিবীয় শক্তি ও সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি রহস্যের সূক্ষ্ম শিল্পী। সে রহস্য ক্ষুরধার হলেও উপভোগ্য। তার জ্বালা নেই, আনন্দ আছে। সত্যের বল প্রবল, যে মার খায় সে পিঠ পেতে দেয়। সত্যের কাছে সকলেই পরাস্ত।'

ঐ বছরেই বিজয়া দশমীর পর আবার এক পত্রে তিনি অমল মিত্রকে লিখেছিলেন :

'কল্যাণীয়েষু,

প্রিয় অমল,

আমার শরীর আর ভালো থাকবার কথা নয়, তাই পত্র লেখা হয়নি ভাই। যখন যা আপনি ঘটে যায় এখন

তাই করি। এই ক'দিন পূর্বে তোমার কথা ও তোমার দৌলতে, মুর্শিদাবাদের যে আনন্দময় দাদাকে পেয়েছিলাম —তাঁর কথা, অনেকক্ষণ আমার মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর 'জগদম্বে' আর Bombay ভুলিনি। তাঁর গুণ বুঝবে কে, সে অমৃত বোস নেই, ওসব অমূল্য জিনিসও বিরল। তাঁকে আমার ৺বিজয়ার বিশেষ অভিবাদন ও নমস্কার জানিও।...'

কেদারবাবুর সঙ্গে আলাপের পর দাদাঠাকুর যখন বিদায় নিয়েছিলেন তখন যে দৃশ্যের উদ্ভব হয়েছিল শ্রীলবকুমার বসু সেটি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় লিখেছিলেন। সেই লেখার অংশটি এখানে দিলাম :

'দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উপর সূর্যের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। আমরা বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময়ে আমি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম যে, বিদায়ের সময় কেদারনাথ এবং দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) আলিঙ্গনে বদ্ধ—বেশ কিছুক্ষণের জন্য এবং তাঁহাদের চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।"

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে একবার অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে জলধর সেন প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। দাদাঠাকুরও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন, তিনি সেই বেতার অনুষ্ঠানের ভাষণে বলেছিলেন—'কালী তিন রকমের অর্থে প্রকাশ পায়, মা-কালী, দোয়াতের কালি আর জুতোর কালি। জুতোর কালি আর কলমের কালিতে যেমন তফাত তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতে পার্থক্য। আমি শরৎদার বিশেষ

গুণমুগ্ধ, তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি, তিনি সুস্থদেহে সুস্থ মনে আনন্দে থাকুন।'

এই ভাষণ শুনে শরৎচন্দ্রের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনার পর বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ দাদাঠাকুরকে নিয়মিত-ভাবে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করেন। দাদাঠাকুর সে অনুরোধ রক্ষা করে নিয়মিত ভাষণ দিতেন। একবার বেতার ভাষণে দাদা-ঠাকুর বলেন—'এখনকার মায়েরা নিজের শিশু সন্তানকে আয়া বা ঝিয়ের হাতে দেখাশোনার ভার অর্পণ করে নিজের কোলে কুকুর ছানাকে নিয়ে আদর করেন। আয়া বা ঝিকে মাসিক বেতন দেন অর্থাৎ স্নেহ-ভালোবাসা ভাড়া নিয়েছেন—এই হলো আধুনিকতা বা Fashion."।

তদানীন্তন বেতারকেন্দ্রের অধ্যক্ষ (ডাইরেকটর) ছিলেন মিঃ স্টেপ্‌লটন্ সাহেব। এই বেতার ভাষণের পর সাতদিনের মধ্যেই মিঃ স্টেপ্‌লটনের কাছে প্রায় চোদ্দ-পনরখানি চিঠি এলো দাদা-ঠাকুরের ঐ ভাষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

চিঠিগুলি পড়ে স্টেপ্‌লটন্ সাহেব বিব্রত হলেন এবং তদানীন্তন প্রোগ্রাম ডাইরেকটর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে ডেকে প্রশ্ন করেন—'কে এই দাদাঠাকুর। অশ্লীল ভাষায় ভাষণ দিয়েছে! যখনই তিনি এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে তাঁকে।' ইংরাজীতে সাহেব বলেছিলেন—'When the Devil comes, bring him to me'।

স্টেপ্‌লটন্ সাহেবের বিরক্তি দেখে নৃপেনবাবু বেশ ভয় পেয়ে বলেছিলেন—'আজই দাদাঠাকুরের প্রোগ্রাম আছে, তিনি এলে আপনার কাছে আনবো।'

নির্দিষ্ট সময়ে বেতারকেন্দ্রে দাদাঠাকুর উপস্থিত হলে নৃপেনবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন—'দাদাঠাকুর, আপনি কি ভাষণ দিয়েছেন জানি না, সাহেব খুব বিরক্ত হয়ে আমাকে ডেকে বললেন—When the Devil comes bring him to me।'

দাদাঠাকুর নৃপেনবাবুকে প্রশ্ন করেন—'Devil শব্দ ব্যবহার করেছেন ?'

নৃপেনবাবু বললেন—'হ্যাঁ। আপনি চলুন তাঁর কাছে।'

দাদাঠাকুর নৃপেনবাবুর সঙ্গে সাহেবের কামরায় প্রবেশ করলেন। সাহেব দাদাঠাকুরকে ইংরাজীতেই প্রশ্ন করলেন—

'So you are Dadathakur ?'

সেই সময় নৃপেনবাবু নিজের কামরায় চলে গেলেন।

দাদাঠাকুর—'Yes, I am।'

সাহেব—'And this is your fashion ?' বলেই সাহেব দাদাঠাকুরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

উত্তরে দাদাঠাকুর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—'Yes, this is my fashion. I do not like that any devil will imitate my fashion as I do not imitate any devil's fashion।

সাহেব—'What is the defination of fashion ?'

দাদাঠাকুর—'Give me paper and pencil, I will give you in writing.'

তখন সাহেব দাদাঠাকুরকে পেন্সিল-কাগজ দিয়ে বসতে বললেন।

দাদাঠাকুর কাগজটিতে লিখলেন :

'Fashion is the thing that arouses passion of the other sex.'

এ প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর বলেছিলেন—'ভাই কি লিখবো জানি না, যাইহোক সাহেব সাত-আটবার আমার লেখাটি উচ্চারণ করে পড়ে নৃপেনকে ডেকে পাঠালেন। নৃপেন আসতে সাহেব বললেন—'Majumdar, Dadathakur is an wonderful gentleman, this is his defination of Fashion.'

নৃপেন মজুমদার মহাশয় স্টেপ্‌লটন্‌ সাহেবকে দাদাঠাকুরের উপর

বিশেষ সন্তুষ্ট দেখে হেসে বললেন—'Sir, we all know that he is wonderful gentleman.'

সাহেব—'How much he gets per programme ?'

নৃপেনবাবু—'Sir, Rupees fifteen only.'

সাহেব—'Make it Rupees twenty five and from to-day. Give him at best four programmes per month.'

সেই থেকে স্টেপ্‌লটন্‌ সাহেব দাদাঠাকুরকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং প্রায়ই আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন দাদাঠাকুর প্রোগ্রাম সেরে রাত সাড়ে ন'টার সময়ে বেতারকেন্দ্রের দোতলা থেকে ছাতা বগলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন এমন সময় স্টেপ্‌লটন্‌ সাহেব তাঁকে ডেকে বললেন—'Dadathakur, why are you carrying umbrella at night, there is no rain, no sun ?'

দাদাঠাকুর—'I hide myself from my creditors.'

সাহেব—'So do I.'

বেতারকেন্দ্র সরকার পরিচালিত হবার পরেও দাদাঠাকুর নিয়মিত প্রোগ্রাম পেতেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় বেতারকেন্দ্রের নতুন নিয়ম হলো—সকলেরই বক্তব্য বেতারকেন্দ্রের অফিসে আগে জমা দিতে হবে সেন্‌সারের জন্য। সে সময় স্টেপ্‌লটন সাহেবের জায়গায় শ্রী এ. কে সেন মহাশয় বেতারকেন্দ্রের ডাইরেক্টর হয়ে এসেছেন। তিনি দাদাঠাকুরের বিশেষ গুণমুগ্ধ।

একদিন বেতারে প্রচারের জন্য দাদাঠাকুর তাঁর বক্তব্য বিষয়টি লিখে নিয়ে বেতারকেন্দ্রের অফিসে গিয়ে সোজা মিঃ এ কে সেনের কামরায় প্রবেশ করে তাঁর হাতে দিলেন।

মিঃ সেন লেখাটি দেখে দাদাঠাকুরকে দিয়ে বললেন—'এটা সেন্‌সার হবে। জমা দিন।'

দাদাঠাকুর—'আপনি সেন, আপনিই স্যার, আপনি লেখাটি পড়ে দেখলেই সেন্‌সার হয়ে যাবে।—আর কিছু করতে হবে না।'

মিঃ সেন হেসে বললেন—'এই কথাটি বলার জন্যেই এসেছেন, অদ্ভুত censor আবিষ্কার করেছেন তো!'

এক সময় শ্রীমতী পদ্মাবতী মিত্র, দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন 'বর্তমানে আপনার মতে রেডিয়োর উন্নতি কি রকম হয়েছে?'

দাদাঠাকুর—'যথেষ্ট হয়েছে, রেডিয়ো চালিয়ে ঘরে বসে কানে খেলা দেখছে, হাততালি দিয়ে 'গোল' বলে চীৎকার করে উঠছে!' একা বাড়ি ফেরার সময় তিনি আরও বলেছিলেন—'দেশে যাবো, যদি কলকাতায় বোমা পড়ে তাহলে একটি পোষ্ট কার্ড লিখো সাধারণ খবর দিয়ে, আর ঐ কার্ডের এক কোণায় লাল কালির দু'টি দাগ দিয়ো, বুঝে নেবো রক্তারক্তি হয়েছে।"—এটা ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা।

হাতিবাগানে ৪নং কার্তিক বসু লেনে দাদাঠাকুরের নামে একখানি নিমন্ত্রণপত্র এলো মেদিনীপুরের জেলা শাসক শ্রী বি. আর. সেন মহাশয়ের কাছ থেকে। পত্রে তিনি জানিয়েছেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছে এবং একটি গ্রন্থাগারও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে করা হয়েছে।—সেই স্মৃতিসভাতে দাদাঠাকুরকে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মেদিনীপুরের সেই সভায় দাদাঠাকুর উপস্থিত হয়ে তাঁর ভাষণে বললেন—'আমরা প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ভুলেছি। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, মিথ্যা কথা কটু বাক্য বলিতে নাই, গুরুজনে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে

নাই।—আমরা তাঁর কোন কথাই স্মরণে রাখি না, কিন্তু উৎসবের বাহুল্য দেখাতে ভুলি না। আমার মনে হয়, তাঁর উপদেশ, তাঁর মাতৃ-ভক্তি ও আদর্শ চরিত্র সকলে যদি শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে পালন করে তাহলে তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানো হয়। তা না হোলে এরকম উৎসবের আয়োজন কোরে তাঁর উপদেশ পালন না কোরে তাঁকে অবজ্ঞা করা হয় বোলে মনে করি। সভাশেষে আমরা সকলে ঘরে ফিরে গিয়েও যেন তাঁর আদর্শপূর্ণ উপদেশগুলি মনে রাখি এই আমার মনের কথা।'

হাতিবাগানে বসবাসের সময়েই শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দাদাঠাকুর একবার গিয়েছিলেন তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। রাজ্যপালের যক্ষ্মা ও বাস্তুহারা-সাহায্য-তহবিলের ঝুলিতে দাদাঠাকুর সাধ্যমত অর্থ দান করেছিলেন সেদিন। দাদাঠাকুরকে কাছে পেয়ে রাজ্যপালের আনন্দের সীমা ছিল না এবং অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ সাহায্য-তহবিলে দেবার জন্য। এরপর তাঁদের মধ্যে নানান্ রসালো আলোচনায় অনেক সময় কেটে গেল। বিদায় নেবার সময় দাদাঠাকুর রাজ্যপালকে বলেছিলেন—'আপনার পিতাঠাকুর পুত্রের নামকরণের সময় একটু ভুল করেছিলেন।'

রাজ্যপাল—'আমার পিতৃদেব আমার নাম রেখেছিলেন 'হরেন্দ্র-কুমার', দেবাদিদেব শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র—এই দুই নামের সংযোগে নাম রেখেছিলেন, ভুল কোথায়!'

দাদাঠাকুর—'যিনি এক আধলা কারও হরণ করেননি, তাঁর নাম হোলো 'হরেন'। জীবনের যা কিছু রোজগার পরের মঙ্গলের জন্য যিনি দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর এ নাম বড়ো শ্রুতিকটু শোনায়। তবে একদিক দিয়ে নামটি খুবই উপযুক্ত হয়েছে। চিরদিনই পরের

দুঃখ হরণ করে আসছেন আপনি। অবশ্য অনেক হরেন আপনারই আশে পাশে আছে।'

মুগ্ধ হলেন রাজ্যপাল। পাশেই বসেছিলেন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা দেবী। তিনি সহধর্মিণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'পণ্ডিতমশায়ের কথা শুনলে?—চাকৃরি রাখা কঠিন হোলো!'

এরপর থেকে মাঝে মাঝেই পত্র দ্বারা দাদাঠাকুরকে রাজভবনে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন রাজ্যপাল।

একদিন রাজ্যপাল দাদাঠাকুরকে বললেন—'পণ্ডিতমশাই, বাঁধাধরা রাজ্যপালের একঘেঁয়ে জীবনে এক এক সময় হাঁফিয়ে উঠি, তাই অনুরোধ করি আপনাকে—এখানে আসবার জন্য। এলে প্রাণ খুলে হাসবার সুযোগ পাই, সেই সঙ্গে মূল্যবান অনেক কথা শুনি।'

উত্তরে দাদাঠাকুর বলেছিলেন—'আপনি Moralist (মরা list), আপনি মোক্ষ লাভ করবেন পরকালে, কিন্তু আপনার আশেপাশে আনেক জ্যান্ত list লোক আছে যারা এ জগতে প্রকৃত সুখী।'

১৯৫০ সালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয়ের জন্মোৎসব পালনের জন্য ডঃ কালিদাস নাগ শ্রীঅমল মিত্রের সঙ্গে গোপনে স্থির করেন। কারণ নাট্যাচার্য এসব পছন্দ করতেন না। ২রা অক্টোবর সকালে ডঃ নাগ উপস্থিত হলেন হাতিবাগানের বাড়িতে। সেখান থেকে সঙ্গে নিলেন দাদাঠাকুর আর লবকুমার বসুকে, আর নিলেন অমল মিত্র ও শ্রীহরি গাঙ্গুলীকে।

হঠাৎ এঁদের উপস্থিতির খবর পেয়ে নাট্যাচার্যের বুঝতে বাকি থাকলো না যে, তাঁর জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। দাদাঠাকুরকে দেখে খুশী হয়ে শিশিরবাবু বললেন—'আপনিও এসেছেন।'

ডঃ নাগ আর অন্যান্য সকলে শুভ শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে নাট্যাচার্যকে

মালা পরালেন। সকলের মধ্যে দাদাঠাকুর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি নাট্যাচার্যকে আশীর্বাদ করলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ কোরে। শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে : মা যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন আর কারো আশীর্বাদ দরকার হয় না, মায়ের আশীর্বাদ সর্বদাই সন্তানকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। যতদিন শিশিরকুমারের মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁকে আশীর্বাদ করতে আসার প্রয়োজন বোধ করিনি। মায়ের আশীর্বাদ সর্বক্ষণ তাঁর মাথায় বর্ষিত হচ্ছিল। কিছুদিন হোলো শিশিরকুমারের মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেছেন। অলক্ষ্যে থেকেও তিনি সর্বক্ষণ আশীর্বাদ করছেন। আমরা সাধারণ মানুষ ভাবি যে, মা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝি শেষ হয়ে গেল। ভুল জেনেও এই ধরনের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয়, তাই আজ এসেছি শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ করতে।' এরপর দাদাঠাকুর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা বলেন শিশিরবাবু দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমি তা মানি না, আমি তাঁর চেয়েও বড় অভিনেতা ; কারণ শিশিরবাবু যে নাটক অভিনয় করেন, সেটি তাঁর পড়া থাকে, মুখস্থ থাকে। কোন্ অঙ্কের পর কোন্ অঙ্ক আসবে, কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য আসবে তা তিনি জানেন এবং দিনের পর দিন মহড়া দেন। অভিনয় করার সময় তিনি স্মারকের সাহায্য পান এবং সহ-শিল্পীরাও সঙ্গে থাকেন।

'কিন্তু আমি একা অভিনয় করে চলেছি। নাটক আমার জানা নেই। কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য আসবে, কখন কোন্ ভূমিকা আমাকে অভিনয় করতে হবে তাও আমার অজানা। এছাড়া আমার স্মারকও নেই।—আমি শিশিরবাবুকেই বলি, আপনি বড় অভিনেতা কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি আপনার চেয়েও বড় অভিনেতা।'

দাদাঠাকুরের ভাষণ শুনে মুগ্ধ হলেন সকলে। দাদাঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করে নাট্যাচার্য বললেন—'আপনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোড়াতেই শ্লোকটি শুনিয়ে আমার অভিমানের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন আপনি।'

এরপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে নাট্যাচার্য বললেন—'পণ্ডিতমশায়ের জন্মদিন পালনের কি ব্যবস্থা করেছেন আপনারা?'

কেউ উত্তর দেবার আগেই দাদাঠাকুর বলে উঠলেন—'শিশিরবাবু, আমি জন্ম-দীন, আমার আবার জন্ম-দিন!'

বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর সহধর্মিণী এলেন রায় একসন্ধ্যায় (৫ এপ্রিল, ১৯৪০) অমল মিত্রের চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে হাতীবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন। তখনও মানবেন্দ্রনাথের গতিবিধির ওপর সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ কড়া নজর রেখেছেন। দাদাঠাকুর সেকথা জানতেন। তাই তাঁরা আসার আগের দিন তিনি অমল মিত্রকে বললেন—'ভাই, ভারত, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের বিপ্লবের সঙ্গে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করার জন্যে যদি সরকারের কু-নজরে পড়ে কিছুদিন জেল খাটতে হয় তাতেও রাজী আছি। জেলে যা খেতে দেবে তা আমার বাড়ির খাবারের চেয়ে খারাপ নয় নিশ্চয়। তাছাড়া আমার বাড়িতে বিছে বেরোয়, জেলে তা নেই।'

সেদিনের সেই আসরে আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক সুহাসচন্দ্র রায় প্রমুখ। দাদাঠাকুর এই আসরে তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও গানে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সকলকে মাতিয়ে রেখেছিলেন।

শ্রীমতী এলেন রায় বাংলা জানতেন না, তাই মানবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন দাদাঠাকুরের আবৃত্তি আর গানের বিষয়বস্তু, সব কিছু বুঝে শ্রীমতী রায়ও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন,

তাই যাবার সময় তাঁরা দাদাঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—'হি ইজ এ জিনিয়াস।'

দাদাঠাকুর মানবেন্দ্রনাথের প্রতি যে কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে মানবেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর জঙ্গিপুর সংবাদ-এ (২০শে মাঘ, ১৩৬০) প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে :

॥ পরলোকে বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ॥

"·· জঙ্গিপুর সংবাদের মত ক্ষুদ্র কাগজ তাঁহার গুণাবলীর বিস্তৃত বর্ণনার পক্ষে অতি সংকীর্ণ। ইংরাজ আমলে যখন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পুলিস সংগোপনে অনুসরণ করিতেছে 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁহার এক স্বজন-গৃহে সস্ত্রীক রায় ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তীর সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।···

'রুশিয়া দেশে লেনিন, ষ্টালিন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন হইয়াও যিনি পরের দেশে থাকা অপেক্ষা ভারতে ইংরাজের জেলখানায় পচিয়া মরা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সহিত যেটুকু সময় অতিবাহিত করা যায়, তাহাই জীবনের শুভ মুহূর্ত। আমাদের মধ্যে একজন সমঝদার সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন, তিনি মহা বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তায় সর্ব বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার গান জানা আছে?' মানবেন্দ্রনাথ উত্তর দিবার পূর্বেই আমি (দাদাঠাকুর) তাঁর হয়ে জবাব দিই—জি. ইউ. এন. (GUN) গান ভাল জানা আছে। মানবেন্দ্রনাথের সহিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন, শ্রীমতী এলেন রায়ও ব্যাপারটি উপলব্ধি করিয়া হাসিয়া উঠেন। এই পরিহাসের পালটা জবাব না দিয়া

তিনি ছাড়েন নাই। ফটো তুলিবার সময় টেবিলেন উপর রাখা খাবারের বাসনগুলি দাদাঠাকুরের সামনে রাখতে বললেয মানবেন্দ্রনাথ।—তাঁরপর একটু হেসে বললেন—'উনি নে আমাদের সঙ্গে খান তার জ্বলন্ত প্রমাণ থেকে যাবে এই ছবিতে।"

তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছিল। দাদাঠাকুরকে জঙ্গিপুর থেকে কলকাতায় আসতে হতো প্রায়ই—রেডিও প্রোগ্রাম করতে। সে সময়ে জনমানুষ কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে বোমা পড়ার আশঙ্কায়। একদিন রেডিও প্রোগ্রাম সেরে জঙ্গিপুরে ফিরে যাবার সময় বলেছিলেন—"যদি কলকাতায় বোমা পড়ে, তাহলে আমি একাই সব প্রোগ্রাম চালিয়ে যাবো। কারণ, অনেক আর্টিষ্ট অনুপস্থিত হচ্ছেন ; বোধহয় বাইরে গেছে। এখন রেডিও প্রোগ্রামের জন্যে চল্লিশ মিনিটে আশী টাকা দেয়, মিনিটে আয় করি দু'টাকা। যখন বাড়ি থেকে আসি তখন আমার বড়ো বৌমা বলেছিলেন— 'কলকাতায় বোমা পড়লে বাবা পনেরো দিনের মধ্যে পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরে আসতে পারবেন।' শুনে বলছিলাম—'বৌমা, আমাকে পায়ে হেঁটে সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতেই হবে। দশ দিন পরে বাড়ি ফিরে হয়তো দেখবো বিনয় শ্রাদ্ধ করতে বসেছে! রাণাঘাটে (নির্মলদের পিসিমার বাড়িতে) একরাত্রি বাস করে আবার হাঁটা শুরু করবো।'

সচরাচর সাধারণ মানুষ অনেক সময় আপন স্বার্থে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না, ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু দাদাঠাকুরের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। ভদ্রতার মুখোসের আড়ালে ভণ্ডামী চাপা আছে জানলে আর রক্ষা থাকতো না। একবার

দাদাঠাকুরের বিবাহযোগ্যা এক কন্যাকে কোন এক পাত্রের পিতা দেখতে এসেছিলেন। মেয়েটি সুশ্রী এবং গায়ের রং রীতিমতো ফর্সা। পছন্দ হবার মতোই পাত্রী। পাত্রের পিতা মুখে প্রকাশ না করলেও দাদাঠাকুর বুঝেছিলেন মেয়ে অপছন্দ হয়নি। কিন্তু দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যখন ভদ্রলোকটি বুঝেছিলেন যে, দেনাপাওনার দিক দিয়ে সুবিধে হবে না, তখন একটু বিনীতভাবে বললেন—'মেয়েটির রং আরো একটু ফর্সা হলে ভালো হতো।'

ভদ্রলোকের মনের কথা দাদাঠাকুর বুঝতে পেরে বললেন—'বর্ণে মিলেছে স্বর্ণে মিলছে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরতে পারেন, আমি ধবল কুষ্ঠ আশ্রমে খবর দিয়ে দেবো, তারা আপনার পছন্দ মতো ফর্সা মেয়ে পাঠাবে।'

আর কোন কথা না বলে ভদ্রলোকটি স্থান-ত্যাগ করলেন।

আর একবার এক ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে এসে দাবিযুক্ত লম্বা এক ফর্দ দাদাঠাকুরের সামনে ধরলেন। তাঁর দাবি-দাওয়া দেখে দাদাঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মশাই, ভাগা দেবেন?'

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ভদ্রলোক দাদাঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কিসের ভাগা?'

উত্তরে দাদাঠাকুর বললেন—'দেখুন, আমরা গরীব গেরস্থ লোক, ইলিশ মাছ সস্তা হলে আস্ত একটা কিনি। কিন্তু আক্রার দিনে ভাগা কেনা ছাড়া তো উপায় নেই। আপনার ছেলের আস্ত দাম আমার সাধ্যাতীত, তাই ভাগার কথা বলছি।'

এরপর অল্পদিনের মধ্যেই মনের মতো এক পাত্রের সঙ্গে দাদাঠাকুরের কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেল। পাত্রের পিতা উঁচু মনের সদাশয় মানুষ।

কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে দাদাঠাকুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য জ্ঞানী-গুণী-ধনী-দরিদ্র সকলেই উৎসুক হতেন।

এক সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতায় একটি ছোট মাসিক পত্রিকা অফিসে দাদাঠাকুর প্রবেশ করেন। সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও আক্রাম খাঁ বসেছিলেন। দুজনেই আনন্দ প্রকাশ করেন দাদাঠাকুরকে দেখে। নজরুল ছিলেন দাদাঠাকুরের বিশেষ স্নেহ-ভাজন। নজরুলের কবিতা দাদাঠাকুর প্রায়ই আবৃত্তি করতেন, নজরুলের গানও গাইতেন। দাদাঠাকুরের প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অসীম। হঠাৎ আক্রাম খাঁ কিছু রস গ্রহণ করার ইচ্ছায় দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন—'দাদা, আমাকে মা-কালীর রূপের অর্থ একটু বোঝাতে পারেন ? মা-কালী এলোকেশী, উলঙ্গ, হাতে খাঁড়া—বরাভয় !—অর্থ কি ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দাদাঠাকুর, 'মা আমাদের জগদম্বা, নিত্য-প্রসবিনী—তাই উলঙ্গ ; খাঁড়া-হাতে দুষ্ট-দমনে যুদ্ধ করার সময়ে তাঁর কেশগুচ্ছ খুলে চরণ-স্পর্শ করায় সেই এলোকেশকে বাঁধতে মা যখন উদ্যত হলেন কেশ তখন মিনতি জানালে—মা, তোমার চরণে আশ্রয় যে পায় সে তো মুক্ত।—সে জন্যেই মা আমাদের মুক্তকেশী। আর তিনি যে দু'হাত তুলে আছেন—তা ভক্ত-সন্তানদের বরাভয় দিতে।'

নজরুলের চোখে জল এসে পড়লো মা-কালীর রূপের বর্ণনা শুনে। তিনি দাদাঠাকুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন—'দাদা উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছেন।'

দাদাঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ সালের 'জঙ্গিপুর সংবাদ'এ প্রকাশিত রচনাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে, ঘটনাটি যদিও খুবই পুরোনো কিন্তু নতুন করে সেটা জানা গেল।

"নজরুল ও দাদাঠাকুর" শিরোনামায় বিদ্রোহী কবির ৭৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নুরুল ইসলাম মোল্লা সাহেবের বিশেষ রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

॥ নজরুল ও দাদাঠাকুর ॥

[বিদ্রোহী কবির ৭৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ রচনা]

(নুরুল ইসলাম মোল্লা)

জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দাদাঠাকুর স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্রোহী কবি নজরুলের এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই সম্পর্ক এক সময় দাদাঠাকুরের অভিন্ন সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যায় প্রায় পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হয়। আর এর অন্যতম কারণ নলিনীকান্ত ছিলেন কবির অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। নলিনীকান্তের মতন নজরুলকেও পণ্ডিতমহাশয় আপন কনিষ্ঠ অনুজের স্নেহ দৃষ্টিতেই দেখতেন। কবিও তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে সকল সময়ে 'দাদা' সম্বোধন করতেন। নজরুল তাঁর হাসির গানের বই 'চন্দ্রবিন্দু' এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্কের নিদর্শন স্বরূপ দাদাঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বইটির উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছিলেন: 'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে —

'হে হাসির অবতার !
লহ চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।'

নজরুলের প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর শোকগ্রস্ত অন্যমনস্ক খেয়ালী কবি পুত্র শোককে ভোলাবার নিমিত্ত-ই 'চন্দ্রবিন্দু'র হাস্যরসের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। আর বুলবুল যখন ইহলোক ছেড়ে চলে যায় তখন শোকে উন্মাদ নজরুল প্রায় কপর্দকশূন্য; এমন কি বুলবুলের শেষকৃত্য করার মত আর্থিক সঙ্গতিও তাঁর ছিল না। তখন কবির একান্ত সুহৃদ 'দাদা' শরৎচন্দ্র পণ্ডিত অযাচিতভাবেই এগিয়ে এসে সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি গোরস্থান পর্যন্ত শবানুগমন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এ ঘটনা আজও সাধারণের অজ্ঞাত। বোধ করি অগ্রজের এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কবি তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' উৎসর্গের মাধ্যমে শোধ করার প্রয়াসী হয়েছিলেন।

নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে নজরুলের প্রথম আলাপ হয়েছিলো শ্রীঅরবিন্দ ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষের মাধ্যমে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'বিজলী' পত্রিকার অফিসে। সে সময় নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন 'বিজলী'র সম্পাদক। আর নজরুল তখন একান্ত তরুণ। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাও তখন প্রকাশিত হয়নি। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে হাবিলদার-কবি কিছু পরিচিতি লাভ করেছেন মাত্র। এগুলির মধ্যে স্মরণীয় 'শাতি-ইল-আরব' কবিতাটি। এর ঠিক কিছুদিন পরে কলকাতায় বিজলীর সম্পাদকীয় দপ্তরেই দাদাঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় নলিনী-কান্তের মাধ্যমে। পরে সে পরিচয় সুগভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়। খ্যাতির মধ্যগগনে আসীন নজরুল নলিনীকান্তের সঙ্গে যখন তাঁর গ্রাম জগতাই-এ বেড়াতে আসেন তখন রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গিয়েছিলেন।

১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। এই পত্রিকার জন্য আশীর্বাণী পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বারীন ঘোষ, কালিদাস রায় প্রভৃতি দিক্‌পাল কবি-সাহিত্যিকগণ। এ সময় দাদাঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর 'ধূমকেতু'র ন'বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। রঘুনাথগঞ্জের 'পণ্ডিত প্রেস' থেকে নিয়মিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশিত হচ্ছে। নজরুলের 'ধূমকেতু' সমগ্র বাংলাদেশে তুলকালাম সোরগোল তুলেছে। 'ধূমকেতু'র প্রতিটি সংখ্যা নজরুল দাদাঠাকুরের নামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সরাসরি দাদাঠাকুরের কোন চিঠি কিংবা আশীর্বাণী এল না 'ধূমকেতু'র জন্য। নজরুলও অভিমান ভরে কিছু চেয়ে পাঠালেন না। বন্ধুরা কবিকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কি ব্যাপার?' কবি হয়তো কৌতুক করে বলে থাকবেন: 'দাদার স্নেহের ভাণ্ডারে ঘাটতি পড়েছে আর কি!' কথাটা দাদাঠাকুরের কানে পৌঁছে গেল। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' কার্যালয়ে

বসেই অগ্রজ পাঠালেন অনুজের উদ্দেশ্যে এক তেজদীপ্ত কাব্যিক আশীর্বাণী। বিচিত্র তার শিরোনাম। কিন্তু দাদাঠাকুরের আশিস্-যুক্ত কবিতাটি 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়নি। কবি ইচ্ছে করেই এটি প্রকাশ করেন নি। কারণ তখন 'ধুমকেতু' তৎকালীন ইংরেজ সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়েছে। দাদাঠাকুরের এই আশীর্বাণী প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতিও রুষ্ট হয়ে সরকার তাঁর ক্ষতি করতে পারে, এমন কি 'জঙ্গিপুর সংবাদ'এ সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হতে পারে—এই কল্যাণ চিন্তাই নজরুলকে কবিতাটি প্রকাশে নিবৃত্ত করেছিলো। এর কিছুকাল পরেই 'ধূমকেতু' বাজেয়াপ্ত হয়। কবি বন্দী হন এবং বিচারে তাঁর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নিম্নে প্রকাশিত সেই ঐতিহাসিক স্মৃতির স্মারকমণ্ডিত বিখ্যাত কবিতাটি সম্পর্কে ১৯৬৪ সালের ২৯শে এপ্রিল দাদাঠাকুর স্বয়ং জনৈক নজরুল-গবেষককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'নজরুল ইংরেজ সরকারের সন্দেহভাজন ছিল। আমার আশীর্বাদ ছাপাইলে তাহার এই কর্মে যথেষ্ট উৎসাহ আছে জানিয়া সরকার আমার একমাত্র মুখের গ্রাস বন্ধ করিয়া দিবে।—একথা আমাকে এবং নলিনীকে জানাইয়াছিল। আমার অন্নের ক্ষতি যাতে না হয়, তজ্জন্যই সে ওটা প্রকাশ করে নাই।'

এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি শিরোনামা সহ প্রকাশিত হলো। এর মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে নজরুল ও দাদাঠাকুরের সম্পর্ক কি গভীর অনুরাগ ও প্রীতিতে পূর্ণ ছিল।

"ধূমকেতু"র জন্য দাদাঠাকুরের কবিতা

'ধূমকেতু'র প্রতি বিষহীন ঢোঁড়ার অযাচিত আশীর্বাদ—

'ধূমকেতু'তে সওয়ার হয়ে
আসরে আজ নামলো কাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী :
তোর সাচ্চা কথার আচ্ছা দাওয়াই

পাবে যারা বেইমান পাজি,
আয় চলে ভাই কাজের কাজী :
'হাবিলদার !' আজ আবিলতার
কল্‌জে বিঁধে এপার-ওপার
চালিয়ে বুলির গোলাগুলি
জাহির কর্ তোর গোলন্দাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী !
কোনটা যদি কোনটা নেকী
কোনটা খাঁটি কোনটা মেকী
দেশের লোকের দেখা দেখি রে
'নজর্ উলের' তীক্ষ্ণ নজর
খাক্ করে দিক দাগাবাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী !
ধরিয়ে দে সব অত্যাচারী
পাকড়া যত হত্যাকারী
জোচ্চোরেদের দোকানদারী
চোখে আঙুল দিয়ে লোকের
দেখিয়ে দে সব ধাপ্পাবাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী !
জানিস কলির বামুন মোরা
কেউটে নই যে আস্ত ঢোঁড়া
কাজেই আশিস ফলে থোড়া রে
মোদের হরি তোদের খোদা যে
তোর উপরে হউন রাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী !
—আশীর্বাদক শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত

দাদাঠাকুর একদিন বললেন—'বোতল পুরাণ' আর 'টাকার শতনাম'-এর মতন এবার কয়েকটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো ভাবছি। বিজ্ঞাপনের শীর্ষে লেখা থাকবে 'মুশকিল আসান'। আর বিজ্ঞাপনে লেখা থাকবে: 'আপনার যা কিছু অসুবিধা বা মুশকিল আছে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে জানালে, আমরা তা লাঘবের যথোচিত ব্যবস্থা করবো। মুশকিলের গুরুত্ব অনুসারে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে—যাকে ইংরাজীতে FEE বলা হয় তাই গ্রহণ করবো। পিতৃবিয়োগে—মাতৃবিয়োগে আমরা অশৌচ পালন করে মাথা নেড়া হবো, শ্রাদ্ধ করবো—আপনার মুশকিলের অবসান করবো। যদি ঘোরতর অন্যায় বা পাপঘটিত কিছু অপরাধ করে থাকেন আমরা তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবো নিজেরা শাস্তি ভোগ করে।—আপনার সকল মুশকিলের অবসান ঘটবে'।

'মুশকিল আসান'-এর বিজ্ঞাপন শেষ অবধি আর দেওয়া হয়নি। এরপর আর একবার বলেছিলেন—'বোতল পুরাণ'-এর মতো একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করবো।—নাম দেবো 'পয়জার'। পুস্তিকাটির আকার হবে একটি 'নাগরা জুতো'র মতো। তার মলাটে লেখা থাকবে—

'নাম মোর পয়জার
লোকে ভয় করে যার
ব্যবহার কিন্তু মোর মিঠে
সাধুর চরণে থাকি— দুশমনের পিঠে।'

—এর একটি নমুনাও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু কি কারণে জানি না তাও প্রকাশ করা হয়নি।

সে সময়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় হাতিবাগানের বাড়িতে দাদাঠাকুরকে ঘিরে আসর বসতো। ভবানীপুর, বালিগঞ্জ প্রভৃতি দূরদূরান্তর থেকে অনেকেই এসে যোগ দিতেন। দাদাঠাকুর সেই সভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে, গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। কখনও কখনও

অহিভূষণ ভট্টাচার্যের, মুকুন্দদাসের বা নজরুলের গানও তিনি গেয়ে শোনাতেন, কবিতাও আবৃত্তি করতেন তাঁদের। যেদিন ডঃ কালিদাস নাগ বা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আসরে উপস্থিত থাকতেন সেদিন আসর অত্যন্ত জমজমাট হয়ে উঠতো। তাঁদের প্রাণখোলা হাসি দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হোতো।

একবার ডঃ কালিদাস নাগের বিদেশ যাত্রার আগে তাঁকে হাতিবাগানের বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুর তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন এই বলে যে, 'ডঃ নাগ, বিদেশে অপনার ওয়েল-ফেয়ার কামনা করার উদ্দেশ্যেই এই ফেয়ার-ওয়েল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।' এই কথায় আন্তরিক খুশী হয়ে ডঃ নাগ দাদাঠাকুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বলেছিলেন—'পণ্ডিতমশাই, সেই আশীর্বাদই করুন।'

যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা সকলেই লক্ষ্য করেছেন দাদাঠাকুরের চটপট উত্তর দেবার কি অসাধারণ ক্ষমতাই না ছিল! কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তিনি এমন সব জোরালো উত্তর দিতেন যা কল্পনার অতীত। বিখ্যাত আইনবিদ ডঃ রাধাবিনোদ পাল দাদাঠাকুরকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন—উত্তর ভাবতে কতক্ষণ সময় লাগে তাঁর। এর উত্তরে দাদাঠাকুর জানান—কয়েক সেকেণ্ডও নয়, তবে কি করে তাঁর মাথায় উত্তর এসে যায় তা তিনি নিজেও জানেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এক সন্ধ্যায় দাদাঠাকুরকে নিয়ে জমাট বৈঠক বসেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত যে কতটা এগিয়েছে সে হুঁশ কারোরই ছিল না বোধহয়। পদ্মাবতী মিত্রের অনুযোগেই পরে জানা গিয়েছিল সেটা। তিনি খাবার আয়োজন করে কয়েকবার নীচের তলা থেকে ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ডাক

ওপরতলায় কারোরই কর্ণগোচর হয়নি। শেষে ভৃত্য রঘুনন্দন যাদবের হিন্দী-বাংলা মেশানো কথায় জানা গেল—বৌদি অনেকবার ডেকেছেন এবং খুব রাগ করেছেন। শোনা মাত্র দাদাঠাকুর বললেন—'চল্ চল্—মা রেগে গেছে।'

নীচে নেমে ভালো ছেলের মতো সবাই খেতে বসেছে, এমন সময় রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে গৃহকর্ত্রীকে বলতে শোনা গেল—'ছেলে-বুড়ো সব সমান!'

সেই শুনে চুপি চুপি একজন দাদাঠাকুরকে বললে—'শুনলেন তো?—ছেলে-বুড়ো দুই-ই বলেছে।' তেমনি চুপি চুপিই উত্তর দিলেন দাদাঠাকুর—'ভাই, ভূমিকম্প হলে কি আর বামুন বাদ যায়!'

দেশ স্বাধীন হবার পর ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে বাংলা শব্দের ব্যবহার করা রীতি হোলো। তারপর আবার বাংলার পরিবর্তে হোলো হিন্দী শব্দের প্রচলন।

এই সময়ে একদিন বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দাদাঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'সরবরাহ বিভাগের ঠিক হিন্দী কি হবে? সুনীতিবাবু উত্তর দেবার আগেই দাদাঠাকুর নিজেই বললেন—'আচ্ছা, হট্ যাও শূয়োর বিভাগ' বললে কি ভুল হবে?'

সুনীতিবাবু দাদাঠাকুরের বাংলা ভাষার হিন্দী করার দক্ষতা দেখে হেসেই আকুল। সুনীতিবাবু দাদাঠাকুরকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং দাদাঠাকুরও সুনীতিবাবুকে বিশেষ স্নেহ করতেন। দাদাঠাকুর প্রায়ই বলতেন—সুনীতিবাবু আমাদের দেশের গৌরব।'

প্রসঙ্গত জানাই, সুনীতিবাবুও প্রায়ই বলতেন আকবরের সভায় বীরবল আর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়—এঁরা খুবই রসিক ছিলেন, কিন্তু দাদাঠাকুরের জ্ঞান এবং রসসৃষ্টি অতুলনীয়।'

১৯৫২ সালে আয়কর বিভাগ থেকে দাদাঠাকুরকে নোটিশ পাঠায় ১৩৫৬-৫৮ এই তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার জন্য।

নির্দিষ্ট দিনে দাদাঠাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমারকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে আয়কর অফিসে গেলেন। অফিসার একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক। জাতিতে মুসলমান। দাদাঠাকুর তাঁকে বললেন—'আমি আয়-ব্যয়ের হিসাব খাতায় রাখি না—তবে প্রত্যেকটি কাজের জন্য রসিদ দিয়ে টাকা নিই। সেই রসিদ বই থেকে হিসাব খাতায় লিখেছি, তার সঙ্গে খরচও লিখে এনেছি—রসিদ বইগুলিও এনেছি আপনি দেখুন।'

রসিদ বই, খাতা পরীক্ষা করে দেখে অফিসারটি দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করে, জানলেন যে তাঁর বাড়িতে তিনি, দিদিঠাকরুণ ও তাঁদের দুই পুত্র আছেন, কন্যাদের বিবাহ হয়ে গেছে।

অফিসারটি মুগ্ধ হয়েছিলেন দাদাঠাকুরের সততা আর দৃঢ়তা দেখে। তিনি বললেন—'পণ্ডিত মশাই, আপনি বাড়ি গিয়ে আপনার যাবতীয় সম্পত্তি আপনাদের চারজনের নামে সমান ভাগ করে ফেলবেন। বুঝে দেখলাম, চারজনের মধ্যে আয়ের টাকা ভাগ হয়ে গেলে ট্যাক্স ধার্য করার মত কিছুই থাকবে না।'

সব কথা শুনে দাদাঠাকুর ধীর-স্থিরভাবে অফিসারটিকে বললেন—'আমি ফিরে গিয়ে আপনার কথামতো আমার সমস্ত সম্পত্তি—চার ভাগ করে ফেলবো। কিন্তু এই তিন বছরের জন্য যা টাকা লাগবে তা আমি দিয়ে রসিদ নিয়ে তবে যাবো।' তারপর বিনয়কুমারকে দেখিয়ে তিনি বললেন—'এটি আমার বড় ছেলে, এর বয়স পঞ্চাশ বছর। আমি যদি গত তিন বছরের ট্যাক্স বাঁচাবার জন্য জাল হিসাব দেখিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিই তাহলে আমার এই ছেলে মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে জানবে—বাবা জোচ্চোর, ক'টা টাকা বাঁচাবার জন্যে জালিয়াতি করলে। ছেলেকে কু-শিক্ষা দিতে পারবো না।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে অফিসারটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাদা-ঠাকুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন—সে তো নেবোই, 'পণ্ডিত-মশাই। আপনি আমার বাবার মতন, আপনার মতো সৎ লোক আমি দেখিনি, আশীর্বাদ করুন আমাকে। আপনি আমাকে আর 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলবেন।'

তখন দাদাঠাকুর অফিসারটিকে আশীর্বাদ করে বললেন—'বাবা, কিছু অন্যায় করোনি, লোকে যেমন চায় তেমনই যুক্তি দিয়েছ তুমি। তবে আমি বাড়ি গিয়ে তোমার কথামতো কাজই করব।'

এক সময়ে দাদাঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সুচিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নির্দেশ মতো তাঁকে পি জি. হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চোদ্দ মাস সুচিকিৎসা এবং সেবাযত্নে আরোগ্য হয়ে শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী ঘরে ফিরে আসেন।

মেয়েটি যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন প্রতিদিন দু'বেলাই খাবার নিয়ে দাদাঠাকুর হাসপাতালে যেতেন। সে সময় ঐ হাসপাতালে অনেক সাহেব ডাক্তার এবং মেমসাহেব নার্স ছিলেন। কন্যার প্রতি দাদাঠাকুরের কর্তব্যবোধ ও স্নেহ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাই দাদাঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে ধন্য বোধ করতেন। ছুটি হতে যেদিন মেয়েটিকে হাসপাতাল থেকে ঘরে আনতে গেলেন সেদিন হাসপাতালের মেমসাহেব নার্সরা দাদাঠাকুরের হাত ধরে সাশ্রুনেত্রে বলেছিলেন—'It is good fortune to be your daughter and good luck to get affectionate father like you.'

দাদাঠাকুর উত্তরে বললেন—'You all have seen for the last fourteen months I am carrying, still the credit

goes to her mother. She carried only for ten months and ten days only.'

মেমসাহেবরা হেসে আকুল। হাসপাতালেরই কর্মী এক ইংরেজ যুবক এগিয়ে এসে দাদাঠাকুরকে বললে—'Sir, I want your help. My name is very bad, everybody laughs at me and I feel shy and small.'

দাদাঠাকুর—'What is your name?'

যুবকটি বললে—'My name is Law Less.'

দাদাঠাকুর বললেন—'You put F before your name. no body will laugh at you, and you will be *'Flawless'*.

যুবকটি সহ উপস্থিত সকলেই একসঙ্গে বলে ওঠে—'Flawless'! সকলেই দাদাঠাকুরের হাত ধরে বলে—'Splendid, you took no time to solve the problem.'

নগ্নপদে দাদাঠাকুরের দূরদূরান্ত ঘোরাফেরার প্রসঙ্গে একটা মজার কথার উল্লেখ করছি এখানে। একবার কোন এক সভায় সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট এক নেতা দীর্ঘদিন পরে দাদাঠাকুরকে দেখে ঠাট্টাচ্ছলেই বললেন—'কি পণ্ডিতমশাই, আজও পায়ে জুতো উঠলো না আপনার?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন—'কি করবো বলুন? সবই কপাল!'

নেতা ভদ্রলোকটি ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করেন—'কপাল কি রকম?'

এবার দাদাঠাকুর বললেন—'ভগবান আপনার কপালে জুতো লিখেছিলেন, তা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বলে ভয়ে বোধহয় বিধাতা আমার কপালে লেখেনি।—তাই ওটা আর হয়নি।'

মোক্ষম উত্তর শুনে একমাত্র কাষ্ঠহাসি ছাড়া প্রশ্নকারীর বোধহয় কিছুই করার ছিল না।

দাদাঠাকুর যখন হাওড়ায় মেয়ের বাসায় থাকতেন সেই সময় কোন কারণে দাসনগরের এক কারখানায় গোলযোগ হওয়াতে পুলিস মোতায়েন হয়েছিল। এই কারণেই দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র অমলকুমার এসে জানালো যে, ঐ কারখানায় বিজ্ঞাপনের দরুন বেশ কিছু টাকা পাওনা রয়েছে। শুনে দাদাঠাকুর ঐ কারখানায় টাকা আদায়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ছেলেকে বললেন—'চলো আমার সঙ্গে।'

অমলকুমার—'বাসে চলুন, অনেকটা পথ।'

দাদাঠাকুর—'তুমি বাসে যাও, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

অগত্যা ছেলে বাপের সঙ্গ নিলেন। পায়ে হেঁটে গিয়ে সেই কারখানায় কাজ সেরে আবার পায়ে হেঁটেই বাসায় ফিরলেন দুজনে। বাসায় ফিরে অমলকুমার একখানি মাদুর বিছিয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করছেন। ওদিকে হাত-পা ধুয়ে দাদাঠাকুর দৈনিক পত্রিকা নিয়ে বসেছেন পাশের ঘরের তক্তোপোশে। হঠাৎ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'পচু, তুমি কি করছো?' উত্তরে অমলকুমার বলেন—'বাবা, একটু বিশ্রাম করছি, বলবেন কিছু?' দাদাঠাকুর—'না, কিছু করতে বলছি না, ভাবছি আমার আগেই সব যাবে।'

অমলকুমার চুপ করে রইলেন।

একবার গঙ্গাস্নান সেরে গামছা পরে ঘরে ফিরলেন দাদাঠাকুর। এই দেখে অমলকুমার বললেন—'বাবা, কাপড় পরে যাননি?'

দাদাঠাকুর—'কাপড় তো পরেই গিয়েছিলাম; কিন্তু স্নান সেরে ভিজে কাপড়টা পরে ফেরবার সময় পথে দেখি আধবয়সী এক যুবতী প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। তাকে কাপড়খানা দিয়ে এসেছি।' কথা ক'টি বলেই নিজের মনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে বুঝতে পেরে তিনি

কৃত্রিম গাম্ভীর্য ধারণ করে কড়া স্বরে বলে উঠেন—'এখন তোমাদের কাপড় থাকে দাও—না থাকে তো বলো, আমি রোদে দাঁড়িয়ে গামছা শুকোই।'

অমলকুমার বললেন—'বাবা, আপনার কাপড়ই তো রয়েছে, এখনই দিচ্ছি।'

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় কত বড় মহৎ ও উদার প্রাণ নিয়ে জন্মেছিলেন মানুষটি।

বিডন স্ট্রীট ডাকঘরে দাদাঠাকুরের একটি পোস্ট বাক্স নেওয়া ছিল—তার নম্বর ছিল ১১৪০৪, কলিকাতা-৬। জরুরী চিঠিপত্র অনেক সময় বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছতে দেরি হয়, হারিয়েও যায় কখনও কখনও। তাই এই ব্যবস্থা। প্রতিদিনই যাতায়াতের পথে তিনি একবার বাক্সটি খুলে দেখে নিতেন চিঠিপত্র আছে কিনা। একদিন সকালে বাক্সটি দেখে ডাকঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র একটি মহিলা এসে তাঁকে স্পর্শ না করে ফুটপাথে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা ঐ মহিলাটি ঐভাবে এসে তাঁকে প্রণাম করায় তিনি একটু আশ্চর্যই হয়েছিলেন। মহিলাটি তাঁকে বললে—'বাবা, আপনি রোজই এখান দিয়ে আসেন যান দেখি। আপনি যে ব্রাহ্মণ তা বুঝতে পারি আপনার পৈতে দেখে। বাবা, আজ আমার মায়ের মৃত্যুর দিন। কোন ব্রাহ্মণকে মিষ্টিমুখ করালে আজ আমার মায়ের আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে। কিন্তু বাবা, আমি পতিতা, তাই আমি ছোঁবো না। ঐ দোকানীকে আমি পয়সা দেবো, সে আপনার হাতে কিছু মিষ্টি তুলে দেবে। আপনি সেই মিষ্টি খেলে আমার মায়ের আত্মার তৃপ্তি হবে।'

দাদাঠাকুর নির্বাক হয়ে তার কথাগুলো শুনলেন। বক্তব্য শেষ করে মহিলাটি করুণ দৃষ্টিতে দাদাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দাদাঠাকুর তাকে বললেন—'কিন্তু মা, তা তো হয় না।'

শুনে মহিলাটির চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। বললে—'কেন বাবা ?'

দাদাঠাকুর বললেন—'তুমি মিষ্টি কিনে নিজে হাতে আমায় দেবে। আমি সেই মিষ্টি তোমার হাত থেকে নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে খাবো। তবেই তো তোমার মায়ের আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে।'

পতিতা মহিলাটির কাছে এ ছিল অকল্পনীয়। সে দাদাঠাকুরের পা দুটি এবার জড়িয়ে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে।

॥ প্রস্থান পর্ব ॥

১৩৭১ সাল থেকেই দাদাঠাকুরের শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ছিল শুধু মনের জোর, তাতেই তিনি মনে করতেন—সব কাজই করবো, সব জায়গাতেই যাবো। কিন্তু দুর্বলতা তাঁকে বাধা দিত। ছানি কাটিয়েও চোখের দৃষ্টি বেশ কমে গিয়েছিল। জঙ্গিপুরে ফিরে যাবার কয়েকদিন পূর্বে এক সন্ধ্যায় ঝড়-জলের মধ্যে তিনি তাঁর দৌহিত্র খোকনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার বাসা থেকে হাতিবাগানে আসেন এবং সেই রাত্রিটি হাতিবাগানের বাসাতেই কাটান। অনেক রকম আলাপ-আলোচনায় বেশ কিছুটা রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে অভ্যাসমত ভোরেই ঘুম থেকে উঠলেন তিনি।

সেই সকালেই দাদাঠাকুরের গুণমুগ্ধ ভক্তদ্বয় ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীভূষণচন্দ্র দাস এলেন দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। সেদিন কেউই আমরা ধারণা করতে পারিনি যে এই-ই শেষ-দেখা দাদাঠাকুরের সঙ্গে। দাদাঠাকুর নিজেই ফোন করে ৺রঘুনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র মাণিকবাবুকে বলেছিলেন হাওড়ার বাসায় পেঁৗছে দিতে। মাণিকবাবু গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। দাদাঠাকুর হাতিবাগানের বাসা থেকে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মেয়ের বাসায়। পরে সেখান থেকে জঙ্গিপুরে ফিরে গিয়ে মাঝে মাঝে পত্র লিখতেন, সেই সকল পত্রে তিনি কলকাতায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন প্রায়ই। একখানি পত্রে দাদাঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়বাবু শ্রীঅমল মিত্রকে জানিয়েছেন যে, 'দুর্বলতার জন্য বাবা ভালোভাবে হাঁটতে পারেন না, কিন্তু হাতিবাগানে যাবার ইচ্ছা তাঁর প্রবল, এক দিন রাস্তায় বেরিয়েও পড়েছিলেন—একাই ! ধ

এই সময়ে একদিন শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত হাতিবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে জানতে পারলাম মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও

স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় নাকি ভরপুর থাকেন দাদাঠাকুর। প্রসঙ্গত অমলকুমার আমাদের কাছে বলেছিলেন—'একদিন হরলিকস নিয়ে পুত্রবধূকে কাছে দাঁড়াতে দেখে বাবা বললেন, 'চারধার Leak করছে, হরলিকস আর ক'দিন ঠেকাবে?' আর একদিনের ঘটনা—সেদিন মা'র দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন—'আর লিঙ্গার করবে না, এবার ফিঙ্গার দেখাবে।' আমাকে বিষণ্ণ দেখে আর একদিন বাবা বললেন, 'শোনো' আমি যেমন তোমাদের বাবা, আমারও তেমনি বাবা ছিলেন।—আমার বাবারও বাবা ছিলেন, এবং তাঁরও।...তাঁদের কারও যদি মৃত্যু না হতো, তাঁরা যদি সকলে এখনও বেঁচে থাকতেন একই সংসারে, তাহলে এ-বাড়িতে জায়গা হতো কি?—খেতেই বা দিতে কি?—অতএব মন খারাপ কোরো না।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসুস্থ অবস্থায় প্রায় চার বছর অতিবাহিত করে ১৩৭৫ সালে বৈশাখের ১৩-তারিখে সাতাশী বছর বয়সে দেহ রাখলেন দাদাঠাকুর। জন্মদিনেই মৃত্যু হোলো তাঁর। এ রকম ঘটনা বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। জন্মদিনে কারো মৃত্যু হলে নাকি পুনর্জন্ম হয় না, এমনি এক বিশ্বাস আমাদের মধ্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর সেই অমর কথাটি মনে পড়ে:

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে
দোঁহে বসিয়াছে।"

নামসূচী

ক :

খ :

গ :

গ :

চ :

জ :

স :

হ :



আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ

॥ চরিত্র চিত্রণ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : নারী রহস্যময়ী — ৫·০০

॥ স্মৃতিকথা ॥

সরলা দেবী চৌধুরানী :
মুখবন্ধ : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
জীবনের ঝরাপাতা — ১৬·০০

বিমানেশ চট্টোপাধ্যায় : কালো চশমার
আড়ালে [রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন] — ৬·৭৫

॥ রম্য কাহিনী ॥

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় :
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট]
রাস্তা — ৮·০০

॥ অপরাধ বিজ্ঞান ॥

ডঃ সুকুমার বসু :
মুখবন্ধ : শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়,
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট]
অপরাধ ও অপরাধী — ১২·০০

॥ উপন্যাস ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রূপসী বিহঙ্গিনী ৫·০০

বিমলজ্যোতি দাস :

মুখবন্ধ : ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

মঞ্জরী ও মধুকর ৫·০০

শিপ্রা দত্ত : আলো-ছায়ার অন্তরালে ৬·০০

বনশ্রী রায় : ধান শুধু ধান ৪·০০

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর : কাদম্বরী, ১৪·০০

কাওআবাতা

[নোবেল পুরস্কার বিজেতা] /

সন্দীপকুমার ঠাকুর : তুষার গ্রাম ৬·০০

॥ গল্প-সংগ্রহ ॥

তারাপদ রাহা : আরব্য রজনী

২য়—৩য় খণ্ড ও ১০—১৬শ খণ্ড প্রতি খণ্ড ৮·০০

মপাসাঁ/অরুণ চক্রবর্তী ও গীতা গুহ রায় :

মপাসাঁর সেরা প্রেমের গল্প ২০·০০

॥ প্রবন্ধ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী ১৬·০০

ডঃ সুকুমার সেন : বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ১৫·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ১০·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ : বাঙালী ৭·৫০

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত :

স্বদেশীয় ভারত বিদ্যা-পথিক ৬·০০

শচীন্দ্র মজুমদার : বিবাহ সাধনা ৩·৫০

॥ কবিতা সঙ্কলন ॥

এজরা পাউণ্ড/সুশীলকুমার দাশগুপ্ত :	
এজরা পাউণ্ডের নির্বাচিত কবিতা	৩০'০০
সন্দীপকুমার ঠাকুর : কোটি পাতার ছন্দ	
[জাপানী কবিতাগুচ্ছ]	১৫'০০

॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

কালীপদ সরকার :	
কৃষ্ণকথা চিরন্তনী	১২'০০
ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত :	
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ	১২'০০
ডঃ সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত :	
সৎ চিৎ আনন্দময় [শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য]	৫'০০

॥ উপকথা ॥

গৌরী ধর্মপাল : মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র	১৫'০০

॥ নাট্য সঙ্কলন ॥

গোপীনাথ নন্দী : উমাবনম্	১০'০০